রবীউল আউওয়াল

মাস

করণীয় ও বর্জনীয়

ربيع الاول

সংকলক ঃ-

বশীর হাসান ক্বাসেমী।

খাদিম,

মাদ্রাসা দারুল উলুম

পাণ্ডুয়া, হুগলী।

আবেদন

সম্মানিত পাঠকবর্গের কাছে আমার আবেদন যে, এই লেখার মধ্যে তথ্যগত, ভাষাগত অথবা বানানের যদি কোন ভুল থাকে তাহলে **WhatsApp** এর মাধ্যমে (ফোন করে নয়) অবশ্যই জানাবেন। আল্লাহ্ তায়ালা আপনাকে উত্তম বদলা দান করবেন।

WhatsApp No- 9474638708.

রবীউল আউওয়াল মাস

'রবীউল আউওয়াল' আরবী হিজরী চান্দ্রবর্ষের তৃতীয় মাস। 'রবী' অর্থ বসন্তকাল, আউওয়াল অর্থ প্রথম; রবীউল আউওয়াল অর্থ প্রথম বসন্ত বা বসন্তের প্রথম মাস। আরবী মাসের নামকরণের সময় যেহেতু এই মাসে বসন্তকাল শুরু হয়েছিলো তাই এই মাসকে 'রবীউল আউওয়াল' নাম দেওয়া হয়। কিন্তু বিখ্যাত মুফাসসির আল্লামা ইবনে কাসীর (মৃত্যু- ৭৭৪ হিঃ) রবীউল আউওয়াল মাসের নামকরণ সম্পর্কে লিখেছেন, ربيع রবী শব্দটি ارتباع শব্দ থেকে এসেছে, অর্থ অবস্থান করা। এই দুই মাস আরবরা বাড়িতেই অবস্থান করতো, তাই এই দুই মাসের মধ্যে প্রথম মাসকে 'রবীউল আউওয়াল' এবং দ্বিতীয় মাসকে 'রবীউল আখির' নাম দেওয়া হয়েছে। (তাফসীরে ইবনে কাসীর- ৪/১৪৬)

রবীউল আউওয়াল মাস ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং মুসলমানদের নিকট খুবই সম্মানিত ও মর্যাদাপূর্ণ মাস। কেননা রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর জীবনের চারটি বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ও অবিস্মরণীয় ঘটনা এই মাসে ঘটেছিলো। ১) রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর জন্ম এই মাসে। ২) তিনি নবুওতের দায়িত্ব পেয়েছেন বা নবী হয়েছেন এই মাসে। ৩) তিনি হিজরত করে মদীনায় পৌঁছেছেন এই মাসে এবং ৪) এই মাসেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেছেন।

রবীউল আউওয়াল জন্মগ্রহণের মাস

প্রায় সমস্ত ঐতিহাসিক, জীবনীকার এবং মুহাদ্দিস একমত যে, রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) 'আমুল ফীল' তথা হস্তিবাহিনীর বছর (অর্থাৎ ইয়ামানের তৎকালীন বাদশাহ আব্‌রাহা যে বছর বিরাট হস্তিবাহিনী নিয়ে কাবা গৃহ ধ্বংস করে তার অস্তিত্ব মুছে ফেলার জন্য অভিযান চালিয়েছিলো। যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পবিত্র কুরআনের 'সূরা ফীল'এ আছে। (পারা নং-৩০, সূরা নং-১০৫) বিস্তারিত আলোচনা তফসীরের কিতাবসমূহে আছে। তাফসীরে ইবনে কাসীর এবং মায়ারিফুল কুরআন দেখতে পারেন।) রবীউল আউওয়াল মাসে সোমবার ভোরবেলায় মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন।

হজরত ইবনে আব্বাস (রাজিঃ) বলেন, 'রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) হস্তিবাহিনীর বছর জন্মগ্রহণ করে।' (আল্ মুজামুল্ কাবীর, হাদীস নং-১২৪৩২, মুস্তাদ্‌রাকে হাকিম, হাদীস নং-৪১৮০)

হজরত ক্বায়েস ইবনে মাখরামা (রাজিঃ) বলেন, 'আমি ও রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) হস্তিবাহিনীর বছর জন্মগ্রহণ করি। অতএব আমরা বয়সে

যমজ। (আল্ মুজামুল্ কাবীর, হাদীস নং-৮৭৩, মুস্তাদ্‌রাকে হাকিম, হাদীস নং-৪১৮৩) স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, আমি সোমবার জন্মগ্রহণ করেছি।' (মুসলিম শরীফ, হাদীস নং-১১৬২)

ইমাম নববী (মৃত্যু- ৬৭৬ হিঃ) বলেন, 'সকলে একমত যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) রবিউল আউওয়াল মাসে সোমবার জন্মগ্রহণ করেছেন। (শারহে মুসলিম- ১৫/১০০) واتفقوا انه ولد يوم الاثنين فى شهر ربيع الاول

ইবনে আব্দুল বার (মৃত্যু- ৪৬৩ হিঃ) লিখেছেন,

ولا خلاف انه ولد يوم الاثنين بمكة فى ربيع الاول عام الفيل

এ সম্পর্কে কোনো মতভেদ নেই যে, রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) হস্তিবাহিনীর বছর রবীউল আউওয়াল মাসে মক্কায় সোমবার জন্মগ্রহণ করেন। (আত্তামহীদ- ৩/২৬) হাফেজ ইবনে কাসীর (মৃত্যু- ৭৭৪) লিখেছেন, প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী হস্তিবাহিনীর অভিযানের ৫০ দিন পর রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) জন্মগ্রহণ করেন। (আল বেদায়া- ২/৩২১)

রবিউল আউওয়াল মাসের কত তারিখে নবী (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) জন্মগ্রহণ করেছেন, এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক এবং জীবনীপ্রণেতাগণ মতানৈক্য করেছেন। ইমাম নববী (মৃত্যু- ৬৭৬ হিঃ) লিখেছেন, জন্মতারিখ সম্পর্কে আলেমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, রবীউল আউওয়াল মসের দুই তারিখ, কেউ বলেন আট তারিখ, কেউ বা বলেন দশ তারিখ, আবার অনেকে বলেন ১২ তারিখ। (তাহ্‌যীবুল আসমা- ১/২৩) এই চারটি অভিমতের মধ্যে আট ও বারো তারিখের অভিমত দুটিই বেশি আলোচিত ও প্রসিদ্ধ। একদল ঐতিহাসিক ও জীবনীকার বারো তারিখকে প্রাধান্য দিয়েছেন অন্য আর একদল ঐতিহাসিক আট তারিখকে প্রাধান্য দিয়েছেন। বিখ্যাত তাবেয়ী ঐতিহাসিক এবং প্রথমসারির সীরাতপ্রণেতা ইবনে ইসহাক (মৃত্যু-১৫১ হিঃ), প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে হিশাম (মৃত্যু-২১৩ হিঃ), মুহাদ্দিস ইবনে হিব্বান (মৃত্যু- ৩৫৪ হিঃ), হাফেজ ইবনে কাসীর (মৃত্যু- ৭৭৪), উপমহাদেশের বিখ্যাত আলিম আবুল হাসান নাদবী (মৃত্যু- ১৪২০ হিঃ), বিখ্যাত মুফাসসির মুফতী মুহাম্মদ শফী (মৃত্যু- ১৯৭৬ খ্রীঃ) প্রমুখ আলেমগণ ১২ তারিখকে প্রাধান্য দিয়েছেন। (দেখুন- সীরাতে ইবনে হিশাম- ১/১৫৮, সীরাতে ইবনে হিব্বান- ১/৩৩, আল্ বিদায়া- ২/৩২০, আস্ সীরাতুন্ নববীয়্যা- ১/১৫৭, সীরাতে খাতামুল আম্বিয়া- ১২ পৃষ্ঠা)

অন্য দিকে শিহাবুদ্দীন ক্বস্ত্বলানী (মৃত্যু- ৯২৩ হিঃ), আল্লামা যুরক্বানী (মৃত্যু- ১১২২ হিঃ), ইমাম ত্বাবারী (মৃত্যু- ৬৯৪ হিঃ), হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ

(মৃত্যু- ৯৬৬ হিঃ), নূরুদ্দীন হালবী (মৃত্যু- ১০৪৪ হিঃ), ইবনুল জাওযী (মৃত্যু- ৫৯৭ হিঃ) সহ আরও বহু মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিক আট তারিখের অভিমতকে সমর্থন করেছেন। (দেখুন- আল্ মাওয়াহিবুল্ লাদুন্নিয়া- ১/৮৫, শারহুয্ যুরক্বানী-১/২৪৭, খুলাসাতু সিয়ারে সাইয়িদিল্বাশার- ১/২৩, তারিখুল খমীস- ১/১৯৬, আস্সীরাতুল হালবিয়্যা- ১/৮৫, সামতুন্ নুজূম- ১/২৯২) উপমহাদেশের বিখ্যাত সীরাতপ্রণেতা মুহাম্মদ ইদ্রীস কান্দালভী (মৃত্যু- ১৩৯৪ হিঃ) লিখেছেন, জন্মতারিখ সম্পর্কে প্রসিদ্ধ অভিমত তো এই যে, ১২ই রবীউল আউওয়াল জন্মগ্রহণ করেছেন। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিকের মতে আট তারিখ অধিক অগ্রাধিকার যোগ্য। (সীরাতে মুস্তোফা-১/৫১) অনেক সীরাতপ্রণেতা আট ও বারো তারিখের মধ্যে কোন একটাকে নির্দিষ্ট না করে লিখেছেন যে, 'আট অথবা বারো তারিখ জন্মগ্রহণ করেন।' যেমন আশরাফ আলী থানবী (মৃত্যু- ১৩৬২ হিঃ) লিখেছেন, 'জন্মতারিখ আট অথবা বারো।' (নাশ্রুত্তীব- ২৮ পৃষ্ঠা)

প্রকাশ থাকে যে, মিশরের বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী মাহমূদ পাশা ফালাকী (জন্ম- ১২৩০ হিঃ ১৮১৫ খ্রিঃ, মৃত্যু- ১৩০২ হিঃ, ১৮৮৫ খ্রিঃ) ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি ভাষায় এক গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। বিখ্যাত অনুবাদক আহমাদ যাকী পাশা (জন্ম- ১২৮৪ হিঃ ১৮৬৭ খ্রিঃ, মৃত্যু- ১৩৫৩ হিঃ, ১৯৩৪ খ্রিঃ) উক্ত গবেষণাপত্রের আরবী অনুবাদ করেন। ১৩০৫ হিজরীতে তা 'নাতায়িজুল ইফহাম ফী তাক্বীমিল আরবি ক্বলাল ইসলাম' নাম দিয়ে পুস্তিকা আকারে মিশর থেকে প্রকাশিত হয়। উক্ত পুস্তিকায় মাহমূদ পাশা ফালাকী জ্যোতির্বিজ্ঞান ও গণিত ভিত্তিক বিভিন্ন দলিল ও তথ্য দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর জন্ম তারিখ হচ্ছে নয় তারিখ। বিস্তারিত আলোচনার শেষে তিনি লিখেছেন,① 'সমস্ত আলেমগণ একমত যে, নবী (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) সোমবার জন্মগ্রহণ করেন। এই মাসের আট ও বারো তারিখের মধ্যে নয় তারিখ ছাড়া অন্য কোন দিন সোমবার হচ্ছে না। অতএব এই তারিখ ছাড়া অন্য কোন তারিখকে জন্মতারিখ বলা সম্ভব নয়। সারকথা, মুহাম্মদ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ৯ই রবীউল আউওয়াল সোমবার, ২০শে এপ্রিল ৫৭১ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।' (৩০ পৃষ্ঠা) এই গবেষণা প্রকাশ হওয়ার পর অনেক সীরাতপ্রণেতা এই

① و قد قال الثقات ان النبى صلى الله عليه و سلم ولد فى ٨ أو ١٠ أو ١٢ من شهر ربيع الاول كما تقدم فى اول المبحث وقد اتفقوا جميعا على ان الولادة كانت فى يوم اثنين و حيث انه لا يوجد بين الثامن و الثانى عشر من هذا الشهر يوم اثنين سوى اليوم التاسع منه، فلا يمكن قط ان نعتبر يوم الولادة خلاف هذا اليوم ويتخلص من هذا ان سيدنا محمدا صلى الله عليه و سلم ولد فى يوم الاثنين ٩ ربيع الاول الموافق ٢٠ ابريل سنة ٥٧١ مسيحية فاحرص على هذا التحقيق ولا تكن اسير التقليد ☆

মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। যেমন শায়েখ মুহাম্মদ আল্ খিদ্রী (জন্ম- ১২৮৯ হিঃ ১৮৭২ খ্রিঃ, মৃত্যু- ১৩৪৫ হিঃ ১৯২৭ খ্রিঃ) 'নূরুল্ ইয়াকীন ফী সীরাতে সাইয়্যেদিল মুরসালীন' গ্রন্থে ১৫ পৃষ্ঠায়, মিসরের ঐতিহাসিক মুহাম্মদ ত্বল্য়াত্ হার্ব্ (মৃত্যু- ১৯৪১ খ্রিঃ) তাঁর 'তারীখু দুওয়ালিল আরব অল ইসলাম' গ্রন্থে ১ম খন্ড ২৩৭ পৃষ্ঠায়, মুয়ীনুদ্দীন আহমাদ নাদবী (জন্ম- ১৯০৩, মৃত্যু- ১৯৭৩ খ্রিঃ) তাঁর 'তারীখে ইসলাম' কিতাবের ১ম খন্ড ২৫ পৃষ্ঠায়, স্বফিউর রহমান মুবারকপুরী (মৃত্যু- ২০০৬ খ্রিঃ) তাঁর বিখ্যাত সীরাতগ্রন্থ 'আর রহীকুল মাখতুম' কিতাবের ৮৩ পৃষ্ঠায়, আল্লামা শিবলী নুমানী (মৃত্যু- ১৯১৪ খ্রিঃ) 'সীরাতুন্ নবী' কিতাবের ১ম খন্ড ১৩৭ পৃষ্ঠায়, কাজী মুহাম্মদ সুলাইমান মনসূরপুরী (মৃত্যু- ১৩৪৯ হিঃ) তাঁর 'রহমাতুল লিল্ আলামীন' গ্রন্থের ৩৪ পৃষ্ঠায়, বিখ্যাত ইসলামী ঐতিহাসিক আকবর শাহ্ খান নাজিবাবাদী (মৃত্যু- ১৩৯৫ হিঃ) 'তারীখে ইসলাম' গ্রন্থে ১ম খণ্ড ৯১ পৃষ্ঠায় এবং সাইয়্যেদ মুহাম্মদ মিয়াঁ (মৃত্যু- ১৩৯৫ হিঃ) তাঁর 'তারীখে ইসলাম' কিতাবের ১ম খন্ড ১৯ পৃষ্ঠায় এই মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

তাফসীরে মায়ারিফুল কুরআন প্রণেতা, প্রসিদ্ধ মুফাসসির মুফতী মুহাম্মদ শফী (মৃত্যু- ১৯৭৬ খ্রিঃ) জন্মতারিখ সম্পর্কে লিখেছেন, এ বিষয়ে সবাই একমত যে নবী (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর জন্ম রবীউল আউওয়াল মাসের সোমবার দিন হয়েছিল। কিন্তু তারিখ নির্ধারণে চারটি বর্ণনা প্রসিদ্ধ আছে, ২, ৮, ১০ ও ১২ রবীউল আউওয়াল। হাফিজ মুগলাত্বাই ২ তারিখের বর্ণনাকে গ্রহণ করে অন্য বর্ণনাগুলোকে দুর্বল বলে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু প্রসিদ্ধ বর্ণনা হচ্ছে ১২ তারিখের বর্ণনা। এমনকি ইবনুল বায্যার তো এই মতের উপর উলামাদের ঐক্যমত উল্লেখ করেছেন। ইবনুল আসীরও কামিলে এই মতটিই গ্রহণ করেছেন। মিশরের মাহমূদ পাশা হিসাবের আলোকে যে নয় তারিখকে গ্রহণ করেছেন তা সূত্রবিহীন উক্তি। যেহেতু চাঁদ উদয়ের স্থান বিভিন্ন তাই গণনার উপর এতটুকু বিশ্বাস ও নির্ভরতা জন্মায় না যে, তার উত্তর ভিত্তি করে সবার বিরোধিতা করা যাবে। (টীকা, সীরাতে খাতামুল আম্বিয়া- ১৩ পৃষ্ঠা)

নবুওয়াত প্রাপ্তির মাস

রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) চল্লিশ বছর বয়সে নবী হন। ইমাম নববী (মৃত্যু- ৬৭৬ হিঃ) বলেন, প্রসিদ্ধ মত এটাই এবং আলেমগণও এ বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। (শারহে মুসলিম-১৫/৯৯) আল্লামা সুহাইলী (মৃত্যু- ৫৮১ হিঃ) বলেন, জীবনীলেখকদের মতে এটাই বিশুদ্ধ। (আর্রাওজুল উনফ- ২/২৫০) এ সম্পর্কেও সকল আলেম একমত যে, 'সোমবার' আল্লাহ্র রসূল

(স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) নবী হয়েছিলেন। যেহেতু স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন যে, 'সোমবার দিন আমাকে নবী বানানো হয়েছে।' (মুসলিম শরীফ, হাদীস নং-১১৬২) কিন্তু মাস ও তারিখ সম্পর্কে উলামাদের মতভেদ আছে। হাফেজ ইবনুল ক্বাইয়িম (মৃত্যু-৭৫১ হিঃ) লিখেছেন, 'রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) হস্তি বাহিনীর বছর হতে একচল্লিশতম বছরে রবীউল আউওয়াল মাসের আট তারিখে নবুওয়াত প্রাপ্ত হন। আধিকাংশ আলেমগণ এই মতই পোষণ করেন।' (যাদুল মায়াদ-১/৭৬) ইবনে আব্দুল বার (মৃত্যু- ৪৬৩ হিঃ) লিখেছেন, 'রসুল (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) চল্লিশ বছর এক দিন বয়সে ৮ই রবীউল আউওয়াল নবুওয়াত প্রাপ্ত হন। (আল্ ইসতিয়াব- ১/৩১) মুফতী মুহাম্মদ শফী সাহেবও লিখেছেন, রসূল (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) চল্লিশ বছর একদিন বয়সে রবীউল আউওয়াল মাসে সোমবার নবী হন।' (কিন্তু মুফতী সাহেব কোন তারিখ উল্লেখ করেননি।) (সীরাতে খাতামুল আম্বিয়া- ৩৪ পৃষ্ঠা) মাওলানা মুহাম্মদ মিয়াঁ সাহেব লিখেছেন, ৯ই রবীউল আউওয়াল সোমবার মোতাবেক ১২ই ফেব্রুয়ারী ৬১০ খ্রিস্টাব্দ নবী হন। (তারীখে ইসলাম-১/৪১) কেউবা আবার ৩রা রবীউল আউওয়াল বলেছেন। (আস্সীরাতুল হালবিয়্যা- ১/৩৪০) আবার কেউ ১লা রবীউল আউওয়ালও বলেছেন। (শারহুয্ যুরক্বানী-১/৩৮৬)

সারকথা, যে সমস্ত আলেমগণ রবীউল আউওয়াল মাসে রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর নবুওয়াত প্রাপ্তির কথা বলেন তাঁরা সকলে কোন একটি তারিখ সম্পর্কে একমত নন। তবে অধিকাংশ ঐতিহাসিক ৮ই রবীউল আউওয়াল বলেছেন। কিন্তু মুহাক্কিক আলেমগণ বলেন যে, প্রথম ওহী অবতীর্ণ হয়েছে এবং রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) নবী হয়েছেন 'রমজান মাসে' রবীউল আউওয়াল মাসে নয়। এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত আলোচনা 'রমজান মাস' অধ্যায়ে আসবে। ইন্শা আল্লাহ্।

হিজরতের মাস

রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ১৩ অথবা ১৪ নববী সালে মক্কা থেকে হিজরত করে রবীউল আউওয়াল মাসে সোমবার দিন মদীনা শরীফের অদূরে 'কুবা' গিয়ে পৌঁছান এবং সেখান থেকে জুম্মার দিন মদীনা শরীফে প্রবেশ করেন। এ বিষয়ে প্রায় সকল আলেমগণ একমত। কিন্তু 'ক্বুবা' পৌঁছনোর দিন রবীউল আউওয়াল মাসের কত তারিখ ছিলো এবং কত তারিখে মদীনায় প্রবেশ করেন এ বিষয়ে ঐতিহাসিক ও সীরাতপ্রণেতাদের মাঝে মতভেদ আছে। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে হিশাম (মৃত্যু-২১৩ হিঃ) ইবনুল আসীর (মৃত্যু-৬৩০হিঃ),

ইবনুল ক্বাইয়িম (মৃত্যু- ৭৫১ হিঃ), আলী মিয়াঁ নাদবী (মৃত্যু- ১৪২০ হিঃ) প্রমুখ সীরাতলেখকগণ লিখেছেন যে, রবীউল আউওয়াল মাসের ১২ তারিখ সোমবার রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কুবায় পৌঁছান। (দেখুন-সীরাতে ইবনে হিশাম- ১/৪৯২, আল কামিল ফিত্তারীখ- ১/৬৯৮, যাদুল্ মায়াদ- ৩/৫২, আস্সীরাতুন্ নাবাবিইয়্যা- ১/২৪৫) বিখ্যাত ঐতিহাসিক হাফিজ ইবনে আব্দুল বার (মৃত্যু- ৪৬৩ হিঃ) লিখেছেন, 'আব্দুর রহমান ইবনে মুগীরা বলেন, রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ১ম হিজরীর ৮ই রবীউল আউওয়াল সোমবার মদীনায় (ক্বুবায়) এসেছিলেন। (আল্ ইসতেয়াব- ১/৪১) আল্লামা শিবলী নুমানী (মৃত্যু- ১৯১৪ খ্রিঃ), কাজী মুহাম্মদ সুলাইমান মনসূরপুরী (মৃত্যু- ১৩৪৯ হিঃ), স্বফিউর রহমান মুবারকপুরী (মৃত্যু- ২০০৬ খ্রিঃ) আকবর শাহ্ খান নজীবাবাদী (মৃত্যু- ১৩৯৫ হিঃ) প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ এই মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। (দেখুন- ইদ্রীস কান্দাল্ভী রচিত সীরাতে মুস্তোফা-১/৩৯৯, সীরাতুন নবী-১/২০১, রাহ্মাতুল্ লিল্ আলামীন- ৮৪ পৃষ্ঠা, আর্ রহীকুল মাখতূম- ২৩৮ পৃষ্ঠা, তারীখে ইসলাম- ১/১৫৭) মক্কা থেকে হিজরত করে ক্বুবায় পৌঁছোনোর তারিখ সম্পর্কে এই দু'টি অভিমত বেশি প্রসিদ্ধ। এছাড়া আরও অভিমতও আছে। হাফেজ ইবনে হাজার আসক্বলানী (মৃত্যু- ৮৫২ হিঃ) আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (মৃত্যু- ৮৫৫ হিঃ) এবং আল্লামা যুরক্বানী (মৃত্যু- ১১২২ হিঃ) রবীউল আউওয়াল মাসের ১ তারিখ, ২রা তারিখ (মাহমূদ পাশা ফালাকী এই মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। নূরুল ইয়াক্বীন- ১/৮১) এবং ১৩ তারিখের অভিমতও উল্লেখ করেছেন। (দেখুন- ফাতহুল বারী- ৭/২৪৪, উমদাতুল ক্বারী- ১৭/৪৯, শারহুয্ যুরক্বানী- ২/১৫১)

ক্বুবায় পৌঁছানোর তারিখ সম্পর্কে যেমন ঐতিহাসিকদের মতভেদ আছে। তেমনই ক্বুবা থেকে মদীনায় পৌঁছানোর তারিখ সম্পর্কেও ঐতিহাসিকদের মতভেদ আছে। কেননা রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ক্বুবায় কতদিন ছিলেন এ সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। ইমাম বুখারী (মৃত্যু- ২৫৬ হিঃ) হজরত উরওয়া ইবনে যুবায়ের (রাজিঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ক্বুবায় দশ থেকে কিছু অধিক রাত ছিলেন। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং- ৩৯০৬) হজরত আনাস (রাজিঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ক্বুবায় চোদ্দ রাত ছিলেন। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং- ৩৯৩২) হাফেজ ইবনুল ক্বাইয়িম এই মতটি গ্রহণ করেছেন। (যাদুল মায়াদ- ৩/৫২) আল্লামা শিবলী নুমানী এবং মুফতী মুহাম্মদ শফীও এই মতটি গ্রহণ করেছেন। (সীরাতুন নবী- ১/২০১, সীরাতে খাতামুল আম্বিয়া- ৫৮ পৃষ্ঠা) কিন্তু অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও সীরাতলেখকের মতে রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু

আলাইহি অ সাল্লাম) সোমবার দিন ক্বুবায় পৌঁছান এবং মঙ্গলবার, বুধবার এবং বৃহস্পতিবার ক্বুবায় থেকে জুময়ার দিন মদীনায় যান। অর্থাৎ আট তারিখ ক্বুবায় পৌঁছালে ১২ তারিখে মদীনায় গেছেন আর ১২ তারিখে ক্বুবায় পৌঁছালে ১৬ তারিখে মদীনায় পৌঁছেছেন। (দেখুন- সীরাতে ইবনে হিশাম- ১/৪৯৪, আস্‌সীরাতুন্‌ নাবাবিইয়্যা, ইবনে হিব্বান- ১/১৪১, রহমাতুল লিল আলামীন- ৮৫ পৃষ্ঠা, তারীখে ইসলাম, নজীবাবাদী- ১/১৫৯, তারীখে ত্বারী- ২/৩৮৩) ①

রসূলুল্লাহ্‌ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর এন্তেকাল

সমস্ত মুহাদ্দিস, ঐতিহাসিক এবং সীরাতপ্রণেতা একমত যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) ৬৩ বছর বয়সে একাদশ হিজরীতে রবীউল আউওয়াল মাসে সোমবার এন্তেকাল করেন। (মুসলিম শরীফ, হাদীস নং- ৪১৯, নাসায়ী শরীফ, হাদীস নং- ১৮৩১) কিন্তু জন্ম তারিখের ন্যায় এন্তেকালের তারিখ সম্পর্কেও ঐতিহাসিকদের মাঝে বিরাট মতভেদ আছে।

এ সম্পর্কে তিনটি অভিমত পাওয়া যায়। আবু নুয়াইম আসবাহানী (মৃত্যু- ৪৩০ হিঃ) হজরত ইবনে আব্বাস (রাজিঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে,

① জনাব স্বফিউর রহমান মুবারকপুরী 'আর্‌ রহীকুল মাখতূম' কিতাবে লিখেছেন, বুখারী শরীফের এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) ক্বুবায় ২৪ রাত ছিলেন। (বুখারী শরীফ-১ম খণ্ড ৬১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪২৮) এ সম্পর্কে জানা দরকার যে, ইমাম বুখারী থেকে তাঁর অসংখ্য ছাত্র বুখারী শরীফ অনুলিপি করেছিলেন, কিন্তু তাঁর বিখ্যাত ছাত্র আল্লামা আবু আব্দুল্লাহ্‌ মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ ফারাব্‌রী (মৃত্যু-৩২০ হিঃ)-এর অনুলিপি ছাড়া অন্য কোন অনুলিপি প্রসিদ্ধ হয়নি। আল্লামা ফারাব্‌রী থেকেও তাঁর বহু ছাত্র বুখারী শরীফ অনুলিপি করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজন হলেন। ১) আবুল্‌ হাইসাম, মুহাম্মদ ইবনে মক্কী আল্‌ মারওয়াযী আল্‌ কুশ্‌মীহানী (মৃত্যু-৩৮৯ হিঃ) ২) আবু আলী, ইবনুস্‌ সাকান (মৃত্যু-৩৫৩ হিঃ) ৩) আবু ইসহাক, ইব্রাহীম ইবনে আহমাদ আল্‌ মুস্‌তামলী (মৃত্যু-৩৭৬ হিঃ) ৪) আবু যায়েদ আল্‌ মারওয়াযী (মৃত্যু-৩৭১ হিঃ) ৫) আবু মুহাম্মদ ইবনে হামুবী আস্‌ সারাখসী (মৃত্যু-৩৮১ হিঃ) (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা-১১/৩৫২) বুখারী শরীফের আলোচ্য হাদীসটিতে মুস্‌তামলী ও হামুবীর অনুলিপি অনুযায়ী اربعا و عشرين ليلة অর্থাৎ ২৪ রাতের কথা আছে, কিন্তু অন্যান্য লিপিকারদের অনুলিপিতে اربع عشرة ليلة শব্দ আছে অর্থাৎ ১৪ রাত। আল্লামা ইবনে হাজার আসক্বলানী বলেন, এটাই সঠিক। (ফাতহুল বারী-১/৫২৫) উক্ত হাদীসটি ওই একই সূত্রে আবু দাউদ শরীফের (হাদীস নং-৪৫৩) মধ্যেও আছে, তাতেও ১৪ রাতের কথা আছে ২৪ রাতের নয়। তাছাড়া উক্ত হাদীসটি হাদীসের অন্যান্য গ্রন্থে বিভিন্নসূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তাতেও ১৪ রাতের কথা আছে ২৪ রাতের নয়। (দেখুন- মুসলিম শরীফ, হাদীস নং-৫২৪, নাসায়ী শরীফ, হাদীস নং-৭০২, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-১৩২০৮, সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস নং-২৩২৮, সুনানে কুবরা, বাইহাক্বী, হাদীস নং-৪২৯৫ ইত্যাদি)

রসূলুল্লাহ্‌ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ১লা রবীউল আউওয়াল এন্তেকাল করেছেন। (দালায়িলুন্‌ নবুওয়াহ্‌, হাদীস নং- ৯০) হাফেজ ইবনে হাজার (মৃত্যু- ৮৫২ হিঃ) লিখেছেন, মূসা ইবনে উকবা, লাইস, খুওয়ারিযমী এবং ইবনে যাবরও এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। (ফাতহুল বারী- ৮/১২৯)

হাকিম নিশাপুরী (মৃত্যু- ৪০৫ হিঃ) আবু উবাইদা মা'মার ইবনে মুসান্না থেকে (মুসতাদরাকে হাকিম, হাদীস নং- ৬৮১৭) ইমাম বাইহাকী (মৃত্যু- ৪৫৮ হিঃ) সুলাইমান ইবনে ত্বরখান তাইমী ও মুহাম্মদ ইবনে কাইস থেকে (দালায়িলুন নবুওয়াহ - ৭/২৩৪) মুহাদ্দিস আব্দুর রয্‌যাক স্বনয়ানী (মৃত্যু- ২১১ হিঃ) ইবনে আব্বাস (রাজিঃ) এর বিশিষ্ট ছাত্র 'ইকরমা' থেকে এবং ইমাম ত্বারী (মৃত্যু- ৩১০ হিঃ) হিজাযের ফিক্বাহ্‌শাস্ত্রবিদগণ থেকে (তারীখে ত্বারী- ৩/২০০) বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্‌ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ২রা রবীউল আউওয়াল সোমাবার এন্তেকাল করেছেন।

অধিকাংশ ইসলামী ইতিহাস গ্রন্থ এবং সীরাত গ্রন্থে আছে যে, রসূলুল্লাহ্‌ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ১২ই রবীউল আউওয়াল এন্তেকাল করেছেন। (দেখুন- তারীখে ত্বারী- ৩/২১৫, আল্‌ কামিল ফিত্তারীখ- ২/১৮৫, তারিখুল ইসলাম, যাহাবী- ১/৫৬৯, শেফাউল গরাম- ২/৪৪৮, আর্‌ রহীকুল মাখতূম- ৬৩০ পৃষ্ঠা, রাহমাতুল লিল আলামীন- ২৩০, সীরাতে মুস্তোফা- ৩/১৬৯, তারীখে ইসলাম, নাজিবাবাদী- ১/২৮৩, তারীখে ইসলাম, মুহাম্মদ মিয়াঁ- ২/১৯৪) কিন্তু সীরাতে ইবনে হিশামের বিখ্যাত ভাষ্যকার আল্লামা সুহাইলী (মৃত্যু- ৫৮১ হিঃ) লিখেছেন, ১২ই রবীউল আউওয়াল মৃত্যুদিবস হতেই পারে না। কেননা বহু বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, রসূলুল্লাহ্‌ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) সোমবার এন্তেকাল করেছেন। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং- ১৩৮৭, মুসলিম শরীফ, হাদীস নং- ৪১৯, নাসায়ী শরীফ, হাদীস নং- ১৮৩১) এ বিষয়টিও বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, যে রবীউল আউওয়াল মাসে এন্তেকাল হয়েছে তার পূর্বের যিলহজ মাসের নয় তারিখ (আরাফাতের দিন) জুম্‌য়াবার ছিলো। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং- ৪৬০৬, মুসলিম শরীফ, হাদীস নং- ৩০১৭, তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং- ৩০৪৩, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং- ১৮৮) অর্থাৎ যিলহজ মাসের ১লা তারিখ ছিলো বৃহস্পতিবার। এখন যদি যিলহজ, মুহাররম এবং সফর এই তিন মাসেই পরিপূর্ণ ৩০ দিনের ধরা হয়, তাহলে ১২ই রবীউল আউওয়াল রবিবার হবে, সোমবার নয়। যদি তিনটে মাসেই ২৯ দিনের ধরা হয় তাহলে ১২ই রবীউল আউওয়াল বৃহস্পতিবার হবে। যদি দু'টো মাস ৩০ দিনের এবং একটা ২৯ দিনের ধরা হয় তাহলে ১২ই রবীউল আউওয়াল শনিবার হবে আর দু'টো ২৯ দিনের আর

একটা ৩০ দিনের ধরলে ১২ই রবীউল আউওয়াল জুম্‌য়াবার হবে। অর্থাৎ সোমবার কোন ভাবেই ১২ই রবীউল আউওয়াল হচ্ছে না। (আর্‌ রাওযুল্ উনফ- ৭/৫৭৭)

আল্লামা সুহাইলী কর্তক উপস্থাপিত প্রশ্নের উত্তরে হাফেজ ইবনে কাসীর (মৃত্যু- ৭৭৪ হিঃ) লিখেছেন, 'মক্কায় যিলকদ মাস ২৯শে শেষ হয়ে বৃহস্পতিবার যিলহজ মাসের প্রথম তারিখ হয়েছিল কিন্তু মদীনায় যিলকদ মাসের ২৯শে চাঁদ দেখা যায়নি যার কারণে ৩০শে মাস হয়ে যিলহজ মাস শুরু হয় শুক্রবার এবং পরের তিনমাস অর্থাৎ যিলহজ, মুহাররম এবং সফর মাসও ৩০শে হয়। এই হিসাবে ১২ই রবীউল আউওয়াল সোমবার হবে। (আস্‌ সীরাতুন নববিইয়্যা- ৪/৫০৯) উলামায়ে কেরাম এই উত্তর পছন্দ করেননি। কেননা এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী যিলকদ থেকে সফর পর্যন্ত পরস্পর চারটি মাস ৩০ দিনের হবে। যা অসম্ভব না হলেও অবশ্যই অস্বাভাবিক। (শারহুয যুরকানী- ৪/১৫৩)

কাজী বদরুদ্দীন ইবনে জামায়াহ্ উত্তর দিয়েছেন যে, প্রসিদ্ধ মতে যে ১২ তারিখে বলা হয়েছে তাতে ১২ তারিখ বলা হয়নি, তাতে বলা হয়েছে لاثنتى عشرة ليلة خلت বার রাত পার হয়ে অর্থাৎ দিন সহ বারো রাত পার হয়ে অর্থাৎ ১৩ তারিখে। তিনটে মাস যদি ৩০ দিনের ধরা হয় তাহলে ১৩ই রবীউল আউওয়াল সোমবার হচ্ছে। প্রসিদ্ধ মতে যে ১২ তারিখ বলা হয়েছে তা ১৩ তারিখ উদ্দেশ্য।' ইবনে রজব হাম্বালী (মৃত্যু- ৭৯৫ হিঃ) এই উত্তরটি পছন্দ করেছেন। (লাতায়িফুল মায়ারিফ- ১/১০৯) কিন্তু ইবনে হাজার আসক্বলানী (মৃত্যু- ৮৫২ হিঃ) লিখেছেন, 'এই উত্তরটি মোটেই ঠিক নয়। কেননা আরবী ভাষায় لاثنتى عشرة ليلة خلت বলে ১২ তারিখই উদ্দেশ্য হয়, তেরো তারিখ নয়।'

এইসব কারণে ইবনে হাজার (রহঃ) সহ বহু মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিক (যেমন মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ শামী (মৃত্যু- ৯৪২ হিঃ) 'সুবুলুল হুদা অর্ রশাদ' কিতাবে-১২/৩০৬ শিহাবুদ্দীন ক্বসত্বলানী (মৃত্যু - ৯২৩ হিঃ) 'আল মাওয়াহিবুল্ লাদুন্নিয়া' কিতাবে- ১/৪৩৭, মুফতী মুহাম্মদ শফী উসমানী (মৃত্যু- ১৯৭৬ খ্রিঃ) 'সীরাতে খাতামুল আম্বিয়া' কিতাবে-১০৪ পৃষ্ঠা) দুই তারিখের অভিমতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ইবনে হাজার (রহঃ) আরো লিখেছেন যে,

و كان سبب غلط غيره انهم قالوا: مات فى ثانى شهر ربيع الاول فتغيرت فصارت ثانى عشر

অর্থাৎ মৃত্যুদিবসের তারিখ সম্পর্কে ভুল হওয়ার মূল কারণ এই যে, আলেমগণ লিখেছিলেন, ''রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ২রা রবীউল আউওয়াল এন্তেকাল

করেছেন, ثانى شهر শব্দটাকে কেউ ভুল করে ثانى عشر করে দিয়েছে যার কারণে অর্থ হয়ে গেছে ১২ই রবীউল আউওয়াল। পরবর্তীতে সেই ভুলটাই প্রসিদ্ধ হয়ে যায়। (ফাতহুল বারী- ৮/১৩০)

আল্লামা সুহাইলী (মৃত্যু- ৫৮১ হিঃ) ২রা রবীউল আউওয়াল এর মতটিকে শুদ্ধ বললেও তিনি ১লা রবীউল আউওয়াল মতটিকে বেশি যুক্তিগ্রাহ্য বলেছেন। কেননা ২রা রবীউল আউওয়াল সোমবার তখন হবে যখন যিলহজ, মুহাররম এবং সফর এই তিনমাস পরস্পর ২৯ দিনের হবে। যা অসম্ভব না হলেও, বিরল। কিন্তু যদি একটা মাস ৩০ দিনে হয় আর দু'টি মাস ২৯ দিনে হয়; যা সাধারণত হয়ে থাকে তাহলে সোমবার ১লা তারিখ হচ্ছে। আল্লামা সাইয়্যেদ সুলাইমান নাদবী (মৃত্যু- ১৯৫৩ খ্রিঃ) ও এই মতটিকে প্রাধ্যনা দিয়েছেন। (টীকা, সীরাতুন নবী- ৫৩১ পৃষ্ঠা)

জন্মতারিখ ও মৃত্যুতারিখ সম্পর্কে মতভেদের কারণ

রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) পরিপূর্ণ দ্বীন উম্মতের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। কিন্তু তিনি তাঁর জন্মতারিখ কখনও বলেননি। সাহাবায়ে কেরাম রসূল (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর খুঁটিনাটি সমস্ত বিষয় সংরক্ষণ করেছেন এবং উম্মতের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। কিন্তু কোন একজন সাহাবীও রসূল (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) -এর জন্মতারিখ এবং মৃত্যুতারিখ বর্ণনা করেননি। (প্রকাশ থাকে যে, হাফেজ ইবনে কাসীর (মৃতু- ৭৭৪ হিঃ) লিখেছেন, 'মুসান্নাক ইবনে আবী শাইবা কিতাবে আছে, হজরত জাবির এবং ইবনে আব্বাস (রাজিঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) হস্তি বাহিনীর বছরের ১২ই রবীউল আউওয়াল সোমবার জন্মগ্রহণ করেন।' (আল্ বিদায়া- ৩/৩৭৫) কিন্তু এই ধরণের কোন হাদীস 'মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা' কিতাবে নেই। এই ভাবে 'মীলাদুন্নবী'-এর উপর লিখিত কিছু পুস্তিকায় লেখা আছে, ''মুসতাদরাকে হাকিম গ্রন্থে আছে যে, হজরত ইবনে আব্বাস (রাজিঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) হস্তি বাহিনীর বছরে ১২ই রবীউল আউওয়াল সোমবার জন্মগ্রহণ করেন।'' এটাও সম্পূর্ণ ভুল, কেননা ইবনে আব্বাস (রাজিঃ) থেকে ১২ই রবীউল আউওয়াল জন্মগ্রহণ সম্পর্কে কোন হাদীস নেই) অর্থাৎ এ সম্পর্কে কোন হাদীস না থাকার কারণেই ইতিহাসবিদ এবং সীরাতপ্রণেতাদের মাঝে এ সম্পর্কে মতভেদ হয়েছে।

জন্মতারিখ ও মৃত্যুতারিখ সম্পর্কে হাদীস না থাকার কারণ

উম্মতের জন্য কী করণীয় এবং কী বর্জনীয়, কোন কাজ করলে সওয়াব

পাওয়া যাবে এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জন হবে তা রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) নিখুঁত ভাবে বিস্তারিত বলে দিয়ে গেছেন। জন্মদিবস পালন করা যদি সওয়াবের কাজ হতো তাহলে রসূল (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) স্বয়ং তাঁর জন্মদিনের তারিখ এবং তা পালন করার নিয়ম অবশ্যই বলে দিয়ে যেতেন। রসূল (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) দীর্ঘ ২৩ বছর নবী হয়ে দুনিয়াতে রইলেন কিন্তু একবারও জন্মদিবস পালন করলেন না, এমনকি জন্মতারিখ পর্যন্ত বলে দিয়ে গেলেন না। এ দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে, নবীর জন্মদিন পালন করা কোনো সওয়াবের কাজ নয়, যদি সওয়াবের কাজ হতো তাহলে তিনি স্বয়ং তা করতেন এবং উম্মতকে তা পালন করার জন্য নির্দেশ দিয়ে যেতেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর অফাতের পর প্রায় ১০০ বছর পর্যন্ত সাহাবায়ে কেরাম দুনিয়াতে ছিলেন। (সর্ব শেষ সাহাবী যিনি এন্তেকাল করেন তিনি হচ্ছেন হজরত আবু তুফাইল আমির ইবনে ওয়াসিলা (রাজিঃ) বিশুদ্ধ মতে তিনি ১১০ হিজরীতে এন্তেকাল করেন। সীয়ারু আ'লামিন নুবালা- ৪/৪৬০) সমস্ত উম্মতের মধ্যে সাহাবায় কেরামগণই সর্বাধিক নবী (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে ভালোবেসেছিলেন। সুন্নতের অনুসরণ, নবীর আদর্শকে জীবনে বাস্তবায়ন এবং নেকী ও সওয়াবের কাজ খুঁজে খুঁজে তার উপর আমল করার ক্ষেত্রে তাঁরাই ছিলেন সর্বাধিক অগ্রগামী। সাহাবায়ে কেরাম হতে হাদীসের শতাধিক গ্রন্থে লক্ষাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কোন একটা হাদীসেও একথা নেই যে, কোন একজন সাহাবীও নবীর জন্মদিবস বা মৃত্যুদিবস পালন করেছেন। এমনকি কোন একজন সাহাবী হতেও বিশুদ্ধ সূত্রে জন্ম বা মৃত্যুর তারিখ পর্যন্ত বর্ণিত হয়নি। এর দ্বারা পরিস্কার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে, নবী (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর জন্মদিন পালন করা কোনও সওয়াবের কাজ নয় এবং এ কারণেই এ সম্পর্কে কোন হাদীস নেই।

একই মাসে জন্ম ও মৃত্যুর কারণ

প্রায় সমস্ত ইসলামী ইতিহাসবিদ এবং সীরাতলেখকগণ একমত যে, রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর জন্ম এবং মৃত্যু একই মাসে অর্থাৎ রবীউল আউওয়াল মাসে। আর যদি আমরা জন্ম ও মৃত্যুর তারিখের বিষয়ে প্রসিদ্ধ মত গ্রহণ করি তাহলে জন্ম ও মৃত্যুর তারিখও একই অর্থাৎ ১২ই রবীউল আউওয়াল। এর প্রকৃত রহস্য তো আল্লাহ্ তায়ালাই ভালো জানেন। তবে উলামায়ে কেরাম লিখেছেন একই মাসে এবং (প্রসিদ্ধ মতে) একই দিনে জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে রহস্য এই যে, উম্মত যেন এই মাসে এবং দিনে আনন্দ উৎসব না করে এবং শোক পালনও না করে। কেননা রবীউল আউওয়াল মাসের ১২ তারিখে যদি কেউ

আনন্দ উৎসব করতে চায় তাহলে ১২ই রবীউল আউওয়াল মৃত্যু দিবস তাকে আনন্দ উৎসব করা থেকে বিরত রাখবে। কোন নবী প্রেমিক, যার অন্দরে বিন্দুমাত্রও নবীর প্রতি ভালোবাসা আছে সে নবীর মৃত্যুদিবসে আনন্দ উৎসব করতে পারে না। এই ভাবে ১২ই রবীউল আউওয়াল মৃত্যুর কারণে শোক প্রকাশ করাও যাবে না। কেননা ওই দিনই জন্মদিন হওয়ার কারণে শোক পালন করতে বাধা দেবে। অতএব বোঝা গেলো যে, জন্ম ও মৃত্যু একই মাসে ও একই দিনে হওয়ার কারণে উক্ত মাসে ও উক্ত দিনে আনন্দ উৎসব করার এবং শোক পালন করার কোন অবকাশই রইলো না।

রবীউল আউওয়াল মাসে এবং সোমবারে জন্মের রহস্য

প্রশ্ন- রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)-এর জন্ম রবীউল আউওয়াল মাসে সোমবারে কেন হলো? আল্লাহ্ তায়ালা চাইলে তো কোন মুবারক মাসে যেমন রমজান মাসে বা চারটি সম্মানীয় মাসের মধ্য হতে কোন এক মাসে হতে পারতো? কোন মুবারক রাতে যেমন শবে ক্বদরে বা জুময়ার রাতে তো হতে পারতো?

উত্তর- এর প্রকৃত রহস্য তো আল্লাহ্ তায়ালাই ভালো জানেন। তবে বিখ্যাত ইসলামী পণ্ডিত ইবনুল হাজ মালেকী (মৃত্যু- ৭৩৭ হিঃ) এ সম্পর্কে চারটি হিকমত ও রহস্য লিখেছেন।

১) বিশুদ্ধ হাদীসে আছে, আল্লাহ্ তায়ালা সোমবার উদ্ভিদজগতকে সৃষ্টি করেছেন। (মুসলিম শরীফ, হাদীস নং- ২৭৮৯) উদ্ভিদ এবং তা থেকে উৎপন্ন ফল ও ফসল মানুষের শারীরিক ক্ষুধা নিবারণ করে, শরীরে শক্তির জোগান দেয় এবং শরীরকে বাঁচিয়ে রাখে। আর রসূল (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এবং তাঁর আনীত পথ ও মত মানুষের আধ্যাত্মিক জগতে শক্তি যোগান দেয় এবং আত্মার শান্তি ও খোরাক জোগায়। সুতরাং শারীরিক প্রয়োজন পূরণ করার জন্য যেমন উদ্ভিদজগতকে সোমবার দিন সৃষ্টি করা হয়েছে তেমন আত্মার প্রয়োজন পূরণ করার জন্য ওই দিনই রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে দুনিয়ার বুকে পাঠানো হয়েছে।

২) রবীউল আউওয়াল মাসের নামের মধ্যে ربيع রবী শব্দ রয়েছে। যার অর্থ বসন্তকাল। এই মাসের নামের সাথে রসূল (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)-এর জন্মের এক বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। বসন্তকালে জমিন থেকে আল্লাহ্ তায়ালার অসংখ্য নিয়ামত সৃষ্টি হয়। যা দ্বারা মানুষ জীবিকা নির্বাহ করে। এই ঋতুতে

সবুজ শ্যামল ও সজীব গাছপালা দেখে মন আনন্দ ও প্রফুল্লতায় ভরে যায়। এই ভাবে রসূল (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)-এর জন্ম, তাঁর সত্তা ও শিক্ষা আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ হতে মানুষের জন্য বিরাট বড় দান ও রহমত এবং মানুষের আত্মার জন্য শান্তি, আনন্দ ও প্রসন্নতার কারণ।

৩) বসন্ত কালের ফসল অন্যান্য সময়ের ফসল থেকে বেশি সুষম ও সুন্দর হয়। এই ঋতুতে দিন ও রাতের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে। এই ভাবে রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)- এর সত্তা ও গুণাবলী সর্বদিক হতে সুষম, সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সুন্দর। তাঁকে যে ধর্ম দেওয়া হয়েছে সেটাও অন্যান্য ধর্মের তুলনায় খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সৌন্দর্যময়।

৪) রমজান মাসে বা অন্য কোন মর্যাদাপূর্ণ বরকতময় মাসে বা দিনে রসূল (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)-এর জন্ম হলে এই ধারণা হতো যে, উক্ত মর্যাদাপূর্ণ বরকতময় মাসে জন্মগ্রহণ করার কারণে তিনি মর্যাদাশালী ও সম্মানিত হয়েছেন। অথচ তাঁর জন্মের কারণেই মাস ও দিন খ্যাতি লাভ করেছে। রবীউল আউওয়াল মাসের ও সোমবার দিনের ফজীলত ও সম্মান তাঁর জন্মের কারণেই হয়েছে, অন্য কোন কারণে নয়। (আল মাদ্খাল্- ২/২৬ - ২৯)

রবীউল আউওয়াল মাসের ফজীলত

রবীউল আউওয়াল মাসের ফজীলত ও শ্রেষ্ঠত্ব তো অনস্বীকার্য। কিন্তু এই শ্রেষ্ঠত্বের কারণে তাতে বিশেষ কোন ইবাদত নির্ধারণ করে নেয়া জায়েয নয়। কুরআন হাদীসে এবং ফিক্বাহ্ ফাতাওয়া ও তাফসীরের নির্ভরযোগ্য কোন কিতাবে এই মাস উপলক্ষে বিশেষ কোন আমল যেমন নামায, রোযা ইত্যাদি সম্পর্কে কোন কিছুই বর্ণিত নেই। সুতরাং 'বারো চাঁদের ফজীলত' নামক কিতাবসমূহে এই মাসের বিভিন্ন তারিখে নানারকম পদ্ধতির নামায, বহুপ্রকার দরূদ ও তার বিরাট বিরাট ফজীলতের কথা যা লেখা আছে, তা কুরআন, হাদীস ও নির্ভরযোগ্য কিতাব দ্বারা প্রমাণিত নয়। তবে এই মাস যেহেতু মহানবী, বিশ্বনবী, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, বিশ্বমানবতার মুক্তির দূত, প্রিয় হাবীব হজরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)-এর জন্ম মাস, তাই সকল মুহাদ্দিস, মুফাস্সির ও আলেম একমত যে, এই মাসটি খুবই সম্মানীয়, ফজীলত ও বরকতপূর্ণ।

এই মাসের ফজীলত ও বরকত অর্জন করার উপায়

পাকিস্থানের বিখ্যাত আলিম মুফতী মুহাম্মদ রিজওয়ান, 'মাহে রবীউল

আউওয়ালকে ফাজায়েল অ আহকাম' কিতাবে লিখেছেন, 'এই মাসের ফজীলত ও বরকত অর্জন করতে হলে, প্রত্যেক কাজে রসূল (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)-এর পূর্ণাঙ্গ অনুকরণ করতে হবে। আকীদা, ইবাদত, আচার ব্যবহার, জীবনযাপন, পারস্পরিক সম্পর্ক ও লেনদেনের ক্ষেত্রে নবীর সুন্নতকে আঁকড়ে ধরতে হবে। শির্ক ও বিদআত পরিহার করতে হবে। আকীদা সংশোধন করতে হবে। ছোট বড় সব ধরণের গোনাহ্ থেকে বাঁচতে হবে। নামায ইত্যাদি আল্লাহ্র আদেশসমূহ গুরুত্ব সহকারে পালন করতে হবে। ইসলামী সমাজ গড়ে তোলার মেহনত করতে হবে। সব ধরণের অইসলামী রীতি-নীতি, লৌকিকতা ও সম্পদের অপচয় ত্যাগ করতে হবে। চরিত্রবান হয়ে উত্তম আচার ব্যবহার যেমন সহনশীলতা, ধৈয্যধারণ, কৃতজ্ঞতা, বিনয়, নম্রতা ইত্যাদি সুস্বভাব ও সদ্গুণ আয়ত্ত করতে হবে। গর্ব, অহংকার, দাম্ভিকতা, হিংসা, বিদ্বেষ, সার্থপরায়ণতা কপটতা ইত্যাদি বদগুণ বর্জন করতে হবে। মোটকথা, নিজ শরীর ও আত্মাকে নবীর আদর্শ দ্বারা সাজিয়ে তুলতে হবে। এই মাসে এবং এই মাসের নির্দিষ্ট কোন তারিখে নিজের পক্ষ হতে বিশেষ কোন আমল আবিস্কার করা যাবে না। আগামীদিনে সৎ কাজ করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে, সমস্ত গোনাহ থেকে সত্যিকার তওবা করে, রসূল (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)-এর সমস্ত হক (যার আলোচনা সামনে আসছে) আদায় করার সংকল্প করতে হবে। এই মাসের ফজীলত ও বরকত অর্জন করার এটাই একমাত্র রাস্তা। এ জন্যই শরীয়তের পক্ষ থেকে এ মাসের জন্য বা এ মাসের কোন নির্দিষ্ট তারিখের জন্য বিশেষ কোন আমল নির্ধারণ করে দেয়নি। কেননা দু'একটা আমল করে নবীর জন্মের উদ্দেশ্য অর্জন করা অসম্ভব। উপরোল্লিখিত সমস্ত আমলগুলো করা যদি সম্ভব না হয় তাহলে এই বরকতপূর্ণ মাসে সমস্ত গোনাহের কাজ থেকে অবশ্যই বাঁচতে হবে। কেননা এই পবিত্র মাসে গোনাহের কাজে লিপ্ত হওয়া খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয়। বর্তমানে এই মাসে, বিশেষ ভাবে ১২ই রবীউল আউওয়াল লোকেরা ব্যাপকহারে গোনাহের কাজে লিপ্ত হচ্ছে। (যার কিছু আলোচনা সামনে আসছে) আল্লাহ্ আমাদের সকলকে হেফাজত কুরন।

উম্মতের উপর আল্লোহ্র রসূলের হক

কুরআন ও হাদীস গবেষণা করে উলামায়ে কেরাম লিখেছেন যে, উম্মতের উপর রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)-এর প্রধানত চারটি হক আছে। ১) রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে অন্তর থেকে রসূল বলে স্বীকার করে তাঁর পরিপূর্ণ আনুগত্য ও অনুসরণ করা। ২) তাঁর সাথে হৃদ্যতাপূর্ণ ভালোবাসা

রাখা। ৩) তাঁর প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা। ৪) তাঁর উপর দরূদ ও সালাম পাঠ করা।

প্রথম হক, ঈমান ও আনুগত্য

রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)-এর হক বা অধিকার সমূহের মধ্যে প্রধানতম অধিকার হলো তাঁর প্রতি ঈমান আনা। অর্থাৎ অন্তর থেকে এ কথা বিশ্বাস করা যে, তিনি আল্লাহর রসূল। তিনি শেষ নবী, তাঁর পর কোন নবী আসবেন না। আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেছেন, 'অতএব তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের এবং আমি যে নূর (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি তার প্রতি ঈমান আনো।' (সূরা আত্ তাগাবুন, আয়াত নং-৮) আল্লাহ্ তায়ালা আরো ইরশাদ করেছেন, 'মুহাম্মদ তোমাদের কোন পুরুষের পিতা নয়; তবে আল্লহ্র রসূল ও সর্বশেষ নবী।' (সূরা আল্ আহযাব, আয়াত নং-৮০)

অতঃপর তাঁর আনুগত্য করা। তিনি যে সব বিষয়ে আদেশ করেছেন তা পালন করা এবং যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকা। কেননা এছাড়া নবী প্রেরণের উদ্দেশ্যই সাধিত হয় না। আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেছেন, 'আমি একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই রসূল পাঠিয়েছি যে, আল্লাহর আদেশে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করবে।' (সূরা নিসা, আয়াত নং-৬৪) আরও ইরশাদ হয়েছে, 'যদি ঈমানদার হয়ে থাকো তাহলে আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের হুকুম মান্য করো।' (সূরা আনফাল, আয়াত নং-১) আরও ইরশাদ হয়েছে, 'এবং রসূল তোমাদের জন্য যা নিয়ে এসেছেন তা তোমরা গ্রহণ করো, আর যা থেকে তিনি তোমাদের নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো।' (সূরা হাশর, আয়াত নং-৭) পবিত্র কুরআনের অসংখ্য আয়াতের দ্বারা মহানবী (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)-এর আনুগত্যের অপরিহার্যতার বিষয়টি প্রমাণিত। তাঁর আনুগত্য করলে কি পুরস্কার পাওয়া যাবে এবং আনুগত্য না করলে তার ভয়াবহ পরিণাম কি হবে তাও সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে, 'আর যে কেহ আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য করবে, তারা ঐ ব্যক্তিদের সঙ্গী হবে যাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন; অর্থাৎ নবীগণ, সিদ্দীকগণ (সত্য সার্থকগণ) শহীদগণ ও সৎকর্মশীলগণ; এবং এরাই সর্বোত্তম সঙ্গী। (সূরা নিসা, আয়াত নং- ৬৯) অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, 'যে কেউ আল্লাহ ও রসূলের অবাধ্যতা করে এবং তাঁর সীমা অতিক্রম করে তিনি তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন। সে সেখানে চিরকাল থাকবে। তার জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।' (সূরা নিসা, আয়াত নং-১৪)

দ্বিতীয় হক, ভালোবাসা

তাঁর সাথে ভালোবাসা রাখা। মহানবী (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কর্তৃক প্রবর্তিত বিধি-বিধানের এমন অনুসরণ উদ্দেশ্য নয়, যেমন সাধারণত দুনিয়ার শাসকদের বাধ্যতামূলকভাবে করতে হয় বরং অনুসরণ বলতে এমন অনুসরণই উদ্দেশ্য যা হবে মহব্বত ও ভালোবাসার ফলশ্রুতি অর্থাৎ অন্তরে রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)-এর মহব্বত ও ভালোবাসা এত অধিক পরিমাণে থাকতে হবে, যার ফলে তাঁর বিধি-বিধানের অনুসরণে বাধ্য হতে হয়। কারণ উম্মতের সম্পর্ক থাকে নিজ রসূলের সাথে বিভিন্ন রকম। একেতো তিনি হলেন আজ্ঞাদানকারী মনিব, আর উম্মত হচ্ছে আজ্ঞাবহ প্রজা। দ্বিতীয়ত তিনি হলেন প্রেমাস্পদ, আর উম্মত হচ্ছে প্রেমিক। আল্লহ্ তায়ালা ইরশাদ করেছেন, '(হে নবী! আপনি তাদের) বলুন, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় করো এবং তোমাদের বাসস্থান- যাকে তোমরা পছন্দ করো- আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং তাঁর পথে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা করো আল্লাহর বিধান (শাস্তি) আসা পর্যন্ত, আর আল্লাহ্ ফাসিক সম্প্রদায়কে হিদায়েত করেন না। (সূরা তওবা, আয়াত নং-২৪)

বিশুদ্ধ হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা, সন্তান ও সমগ্র মানুষ হতে প্রিয়তম হবো। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং-১৫) অন্য এক হাদীসে আছে, একদা হজরত উমর (রাজিঃ) রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমার নিকট আমার নিজের জীবন বাদে সকলের চেয়ে অধিক প্রিয়। উত্তরে রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেলেন, না, আমার প্রাণ যার হাতে তার শপথ! তোমার কাছে আমি যেন তোমার জীবনের চেয়েও প্রিয় হই। তখন উমর (রাজিঃ) তাঁকে বললেন, আল্লাহ্র কসম! এখন আপনি আমাকে কাছে আমার প্রাণের চেয়েও বেশি প্রিয়। নবী (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বললেন, হে উমর! এখন (তুমি সত্যিকারের ঈমানদার হলে)। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং- ৬৬৩২) এছাড়া আরও বহু আয়াত ও হাদীস আছে যা দ্বারা উম্মতের জন্য নবীর সাথে মুহাব্বত ও ভালোবাসা রাখা ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়।

তৃতীয় হক, সম্মান প্রদর্শন

তৃতীয় হক তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ

সাল্লাম)-এর আনুগত্য ও অনুসরণ এবং তাঁর সাথে গভীরতম প্রেম ও ভালোবাসা প্রত্যেক উম্মতের জন্য অবশ্যকর্তব্য তো আছেই। কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাদের রসূলে মকবুল (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) সম্পর্কে শুধু আনুগত্য ও ভালোবাসার উপর ক্ষান্ত করেননি; বরং উম্মতের উপর তাঁর প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা ও মর্যাদা দান করাকেও অবশ্যকর্তব্য সাব্যস্ত করে দিয়েছেন। উপরন্তু কুরআনে-কারীমের বিভিন্ন স্থানে তার রীতিনীতির শিক্ষাও দেওয়া হয়েছে। যেমন সূরা আল্ ফাতাহ্ ৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে, وَ تُعَزِّرُوْهُ وَ تُوَقِّرُوْهُ অর্থাৎ তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করো এবং তাকে পরিপূর্ণ মর্যাদা দান করো। একটি আয়াতে এই হিদায়েতও দেওয়া হয়েছে যে,

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ

অর্থাৎ হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্ ও রসূলের সামনে অগ্রণী হয়ো না এবং আল্লাহ্কে ভয় করো।' (সূরা হুজুরাত, আয়াত নং-১) অন্য এক আয়াতে আছে,

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَ لَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَ اَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ

অর্থ মুমিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং তোমরা একে অপরের সাথে যেরূপ উচ্চস্বরে কথা বলো, তাঁর সাথে সেইরূপ উচ্চস্বরে কথা বলো না। এতে তোমাদের আমল নিস্ফল হয়ে যাবে এবং তোমরা টেরও পাবে না।' (সূরা হুজুরাত, আয়াত নং-২) এক আয়াতে বলা হয়েছে যে, মহানবী (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে ডাকার সময় আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখবে; এমন ভাবে ডাকবে না, যেভাবে নিজেদের মধ্যে একে অপরকে ডেকে থাকো। বলা হয়েছে: لَا تَجْعَلُوْا دُعَآءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا অর্থ - 'রসূলের আহ্বানকে তোমরা তোমাদের একে অপরকে আহ্বাণের মতো গণ্য করো না।' (সূরা নূর, আয়াত নং-৬৩) এ কারণেই সাহাবায়ে কেরাম (রাজিঃ) যদিও সর্বক্ষণ সর্বাবস্থায় মহানবী (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)-এর কর্মসঙ্গী ছিলেন এবং এমতাবস্থায় সম্মান ও আদবের প্রতি পরিপূর্ণ লক্ষ্য রাখা বড়ই কঠিন হয়ে থাকে তা সত্ত্বেও তাঁরা নবীর যে পরিমাণ সম্মান করতেন তা আমরা কল্পনাও করতে পারবো না।

উরওয়া ইবনে মাসউদকে মক্কাবাসীরা গুপ্তচর বানিয়ে মুসলমানদের অবস্থা জানার জন্য পাঠালো। সে সাহাবায়ে কেরাম (রাজিঃ) কে হুজুর(স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)-এর প্রতি এমন নিবেদিত প্রাণ দেখতে পেল যে, ফিরে গিয়ে

রিপোর্ট দিল, "হে আমার কওম, আল্লাহর শপথ! আমি অনেক রাজা-বাদশাহর দরবারে প্রতিনিধিত্ব করেছি। কাইসার, কিসরা ও নাজ্জাশী সম্রাটের দরবারে দূত হিসেবে গিয়েছি; কিন্তু আল্লাহর কসম করে বলতে পারি যে, কোন রাজা-বাদশাহকেই তাঁর অনুসারীদের এত সম্মান করতে দেখিনি, যেমন মুহাম্মদের অনুসারীরা তাঁকে সম্মান করে থাকে। আল্লাহর কসম্! যখন তিনি থুথু ফেলেন তখন তা কোন সাহাবীর হাতে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে তারা তা তাদের গায়ে মুখে মেখে ফেলেন। তিনি কোন আদেশ দিলে তারা তা সঙ্গে সঙ্গে পালন করেন। তিনি ওজু করলে তাঁর ওজুর ব্যবহৃত পানি নেওয়ার জন্য সাহাবীগণের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়। তিনি কথা বললে সাহাবীগণ নিশ্চুপ হয়ে শুনেন। এমনকি তাঁর সম্মানার্থে তারা তাঁর চেহারার দিকেও তাকান না।" (বুখারী শরীফ, হাদীস নং-২৭৩১) এই শ্রদ্ধা ও মর্যাদাবোধের বরকতই তারা নবুয়তী ফয়েজ থেকে বিশেষ উত্তরাধিকার লাভ করতে পেরেছিলেন। এবং আল্লাহ তায়ালাও এ কারণেই তাদেরকে আম্বিয়া (আলাইহিমুস সালাম) এর পর সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করেছেন।

চতুর্থ হক, দরূদ ও সালাম পাঠ করা

চতুর্থ হক, তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ করা। রসূল (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)-এর আনুগত্য, তাঁর প্রতি ভালোবাসা ও সম্মান প্রদর্শন করার সাথে সাথে তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ করা মুসলমানদের জন্য অবশ্যকর্তব্য। আল্লাহ্ তায়ালা এ সম্পর্কে মুসলমানদের নির্দেশ দিয়ে ইরশাদ করেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবী (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)-এর প্রতি রহমত প্রেরণ করেন। হে মুমিনগণ! তোমরাও তাঁর জন্য রহমতের দু'য়া করো (অর্থাৎ দরূদ পড়ো) এবং খুব সালাম প্রেরণ করো।" (সূরা আহযাব, আয়াত নং-৫৬) আয়াতের মূল উদ্দেশ্য ছিল, মুসলমানদেরকে রসূলুল্লাহ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)-এর প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ করার আদেশ দান করা। কিন্তু তা এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, প্রথমে আল্লাহ স্বয়ং নিজের ও তাঁর ফেরেশতাগণের দরূদ পাঠানোর কথা উল্লেখ করেছেন। অতঃপর সাধারণ মুমিনগণকে দরূদ ও সালাম প্রেরণ করার আদেশ দিয়েছেন। এতে রসূল (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)-এর মাহাত্ম্য ও সম্মানকে এত উচ্চে তুলে ধরা হয়েছে যে, রসূল (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)-এর শানে যে কাজের আদেশ মুসলমানদেরকে দেওয়া হয়েছে, সে কাজ স্বয়ং আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণও করেন। অতএব যে মুমিনগণের প্রতি রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)-এর অনুগ্রহের অন্ত নেই, তাদের তো একাজে খুবই যত্নবান

হওয়া উচিত। এ বর্ণনাভঙ্গীর আরও একটি উপকারিতা এই যে, এতে করে দরূদ ও সালাম প্রেরণকারী মুসলমানদের একটি বিরাট শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছে। কেননা আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে এমন এক কাজে শরীক করে নিয়েছেন, যা তিনি নিজেও করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও করেন। (মায়ারিফুল কুরআন- ৭/২২১)

হজরত আবু হুরায়রা (রাজিঃ) থেকে বর্ণিত বিশুদ্ধ হাদীসে আছে। রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরূদ পাঠ করে আল্লাহ তায়ালা তার ওপর দশবার রহমত নাযিল করেন। (মুসলিম শরীফ, হাদীস নং- ৪০৮) অন্য এক সহী হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করবে আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশবার রহমত নাযিল করবেন, তার দশটি গুনাহ মিটিয়ে দেওয়া হবে এবং তার জন্য দশটি মর্যাদা উন্নীত করা হবে। (নাসায়ী শরীফ, হাদীস নং- ১২৯৭) অন্য এক সহী হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি দরূদ পাঠাতে ভুলে গেলো সে জান্নাতের পথই ভুলে গেলো। (ইবনে মাজা শরীফ, হাদীস নং- ৯০৮) আর এক হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, কৃপন সেই ব্যক্তি যার কাছে আমার আলোচনা করা হয় অথচ সে আমার উপর দরূদ পড়ে না। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং- ৩৫৪৬)

দরূদ ও সালামের জরুরী মাসআলা

মাস্আলা- সারা জীবনে কমপক্ষে একবার দরূদ পাঠ করা ফরজে আইন। (শামী- ১/৫১৫) নামাযের শেষ বৈঠকে দরূদ পাঠ করা সুন্নতে মুআক্কাদাহ্। (মারাকিল ফালাহ- ২৭১ পৃষ্ঠা)

মাস্আলা- রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)-এর নাম মুখে উচ্চারণ করলে বা শুনলে দরূদ পাঠ করা ওয়াজিব। কেননা, হাদীসে এরূপ ক্ষেত্রে দরূদ পাঠ না করার কারণে শাস্তিবাণী বর্ণিত আছে। তিরমিযী শরীফের এক রেওয়ায়েতে আছে, রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, সেই ব্যক্তি অপমানিত হোক, যার সামনে আমার নাম উচ্চারণ করা হলে দরূদ পাঠ করে না। (হাদীস নং- ৩৫৪৫)

মাস্আলা- একই মজলিসে বারবার নাম উচ্চারিত হলে বা শুনলে একবার দরূদ পাঠ করলেই ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু প্রত্যেকবার পাঠ করা মুস্তাহাব। মুখে নাম উচ্চারণ করলে বা শুনলে যেমন দরূদ পড়া ওয়াজিব, তেমনি কলমে লেখার সময়ও দরূদ লেখা ওয়াজিব। এক্ষেত্রে সংক্ষেপে সা. বা সাঃ

ইত্যাদি লেখাও যথেষ্ট নয়। সম্পূর্ণ দরূদ লেখা বিধেয়। (শামী- ১/৫১৮)

মাস্আলা- দরূদ ও সালাম উভয়টি একসাথে পাঠ করাই উত্তম ও মুস্তাহাব। যেমন 'স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম' বলা বা আলাইহিস্ স্বলাতু অস্ সালাম' বলা। শুধু 'আলাইহিস্ স্বলাত' বা 'আলাইহিস্ সালাম' বলা উত্তম নয়।

মাস্আলা- নবী, রসূল ও ফেরেশতা ব্যতীত অন্য কারও জন্য স্বতন্ত্র ভাবে স্বলাত তথা দরূদ ব্যবহার করা বৈধ নয়। অতএব আলী 'স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম' বলা যাবে না। তবে রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)-এর সাথে সংযুক্ত করে তাঁর বংশধর, সাহাবা অথবা মুমিনগণকে স্বলাত তথা দরূদের মধ্যে শরীক করা যাবে। স্বলাতের ন্যায় সালামও নবী, রসূল ও ফেরেশতা ব্যতীত অন্য কারও জন্য ব্যবহার করা বৈধ নয়। তবে কাউকে সম্ভাষণের সময় 'আস্সালামু আলাইকুম' বলা সুন্নত। অতএব কারও নামের সাথে 'আলাইহিস্ সালাম'ও বলা যাবে না। কেননা দরূদ ও সালাম নবী ও রসূলগণের বৈশিষ্ট্য, অপরের জন্য জায়েয নয়। (আল্ আযকার, নববী- ১/১১৮, শামী- ৬/৭৫৩)

মাস্আলা- হাদীসের গ্রন্থসমূহে রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) থেকে বিভিন্ন শব্দে দরূদ বর্ণিত আছে। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং- ৩৩৬৯, ৩৩৭০, ৪৭৯৭, ৪৭৯৮, মুসলিম শরীফ, হাদীস নং- ৪০৫, আবু দাউদ শরীফ, হাদীস নং- ৯৮১, ৯৮২, এসব হাদীসে এবং এছাড়া আরো বহু হাদীসে বিভিন্ন শব্দে দরূদ ও সালাম বর্ণিত হয়েছে) দরূদ ও সালামের শব্দসম্বলিত শিরকমুক্ত যেকোন বাক্য দ্বারা এবং যে কোন ভাষায় এ আদেশ পালিত হতে পারে। হুবহু সেই বাক্য রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) থেকে বর্ণিত হওয়া জরুরী নয়। বরং যে কোন বাক্যে যেকোন ভাষায় দরূদ ও সালাম ব্যক্ত করা হলে আল্লাহর আদেশ প্রতিপালিত ও দরূদের সওয়াব হাসিল হয়ে যায়। তবে রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) থেকে বর্ণিত বাক্যে দরূদ পাঠ করা হলে যে অধিক বরকত ও সওয়াবের কারণ হবে, তা বলাই বাহুল্য। (মায়ারিফুল কুরআন-৭/২২৩)

মাস্আলা- বিনা ওজুতে (এমনকি শরীর নাপাক থাকলেও), শুয়ে-বসে, হাঁটা-চলা সর্বাবস্থায় দরূদ পড়া যায়। জুম্য়া বা ঈদের খুতবায় নবীজী (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)-এর নাম আসলে মনে মনে দরূদ পড়বে, মুখে উচ্চারণ করবে না। দরূদ শরীফ পড়ার নিয়ম হলো, দিলে অত্যন্ত মুহাব্বতের সাথে ধীরস্থির ভাবে হালকা আওয়াজে চুপে চুপে পড়বে। দরূদ শরীফ পড়ার সময় ঢুলতে থাকা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হেলাতে থাকা এবং উঁচু আওয়াজে পড়া উচিত নয়। (আদ্দুর্রুল মুখতার-১/৫১৯)

মাস্আলা- দরূদ শরীফ পড়ার স্থান হলো, নবীজী (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)-এর

রওজা শরীফ যিয়ারতের সময়, নবীজী (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)-এর নাম বলা বা শোনার সময় , মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময়, মসজিদ থেকে উঠার সময়, দু'য়ার পূর্বে, মাঝে ও শেষে, আযানের পরের দু'য়ার পূর্বে, ওজুর শেষে, কিতাব, চিঠিপত্র বা অন্য কিছু লিখার পূর্বে, শুক্রবার দিন ও রাতে ইত্যাদি সময় দরূদ শরীফ পড়া মুস্তাহাব। (শামী- ১/৫১৮)

মীলাদ শব্দের অর্থ

মীলাদ ও মাওলিদ শব্দদ্বয় আরবী ولد মূল ধাতু হতে নির্গত। তবে 'মাওলিদ' শব্দটি জন্মকাল ও জন্মস্থান উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়, কিন্তু 'মীলাদ' শব্দটি শুধুমাত্র জন্মকাল বা ভূমিষ্টের সময় অর্থেই ব্যবহৃত হয়, জন্মস্থান অর্থে নয়। বিখ্যাত আরবী অভিধান লিসানুল আরব- ৩/৪৬৮, তাজুল উরূস - ৯/৩২৭, আল্ মিস্বাহুল মুনীর ২/৬৭১ ইত্যাদি গ্রন্থে আছে -

المولد : الموضع والوقت، والميلاد : الوقت لا غير

অতএব 'মীলাদুন্ নবী' -এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে - নবীর জন্মকাল। কিন্তু বর্তমানে 'মীলাদ' বা 'মীলাদুন নবী' বলে শুধু নবীর জন্মকালকে বোঝায় না। বর্তমানে মীলাদ, মীলাদুন্ নবী বলে নবী (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)-এর জীবনী নিয়ে বিশেষত নবীর জন্মকাল বা বাল্যকালের ঘটনা নিয়ে আলোচনা করাকে বোঝায়। এই তথাকথিত মীলাদ দু'ভাবে বিভক্ত। প্রথমত 'সহীহ মীলাদ'। দ্বিতীয়ত 'প্রচলিত মীলাদ'।

সহীহ মীলাদুন্ নবী

মহানবী ও শ্রেষ্ঠ রসূল হজরত মুহাম্মদ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)-এর প্রতি ভালোবাসা ও গভীর মহব্বত রাখা ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পৃথিবীর সবকিছু থেকে নবীজী (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)-এর মুহাব্বত ও ভালোবাসা সবচেয়ে বেশি থাকা প্রতিটি মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। নবীজী (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)-এর প্রতি এই মুহাব্বত ও ভালোবাসার কারণেই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, নবীজীর পবিত্র জীবনী নিয়ে আলোচনা করা, তার জীবনের ঘটনাবলী বলা ও শোনা, তাঁর স্মৃতিচারণ করা উচ্চ পর্যায়ের ইবাদত বরং ইবাদতের প্রাণ। তাঁর জীবনের প্রত্যেকটা ঘটনা (যা বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত) চিরস্মরণীয়। তাঁর জন্মকাল, শৈশবকাল, যৌবনকাল, তাঁর নবুওয়াত প্রাপ্তি, তাঁর দাওয়াত ও জিহাদ, তাঁর চিন্তাভাবনাও ধ্যানধারণা, তাঁর ত্যাগ ও তিতিক্ষা, তাঁর ইবাদত ও নামায, তাঁর আচার-ব্যবহার ও স্বভাব চরিত্র, তাঁর জীবনী ও আদর্শ, তাঁর ধর্মানুরাগ ও ধার্মিকতা, তাঁর জ্ঞান

গরিমা, তাঁর উঠা-বসা, চলা-ফেরা, নিদ্রা ও জাগরণ, তাঁর সন্ধি ও সংঘাত, তাঁর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি, তাঁর ক্রোধ ও দুঃখ, তাঁর স্নেহ ও মমতা, তাঁর হাসি মশকরা ও কান্নাকাটি মোটকথা তাঁর প্রতিটি কাজকর্ম ও আচার আচরণ উম্মতের জন্য উত্তম আদর্শ ও হেদায়েতের মাধ্যম। এগুলো শিক্ষা করা, শিক্ষা দেওয়া, অলোচনা করা, দাওয়াত দেওয়া উম্মতের জন্য অবশ্যকর্তব্য। এই ভাবে রসূল (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তি ও বস্তুর আলোচনা করাও ইবাদত ও সওয়াবের কাজ। অতএব রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর বন্ধু বান্ধব, তাঁর সঙ্গীসাথী, স্ত্রী-পুত্র, চাকর বাকর, তাঁর পোশাক পরিচ্ছেদ, অস্ত্রশস্ত্র, তাঁর যানবাহন উট, ঘোড়া ইত্যাদির আলোচনাও ইবাদত ও সওয়াবের কাজ। কেননা এসব বস্তুর আলোচনা দ্বারা মূলত নবীজীর আলোচনায় উদ্দেশ্য।

রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)-এর জীবনের দুটি অংশ আছে। প্রথমত জন্ম হতে নবী হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত। দ্বিতীয়ত নবী হওয়া থেকে অফাত পর্যন্ত। প্রথম অংশের বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হাদীস ও সীরাতগ্রন্থে আছে। নবীর জীবনের দ্বিতীয় অংশ যাকে কুরআনে উম্মতের জন্য 'উত্তম আদর্শ' বলা হয়েছে তার সম্পূর্ণ রেকর্ড হাদীস ও সীরাত গ্রন্থে সংরক্ষিত আছে। যা পড়লে এমন মনে হয়, যেন রসূল (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাঁর সমস্ত গুণাবলী সহ আমাদের দৃষ্টির সামনে চলাফেরা করছেন। এটা ইসলামের এক বিরাট বিস্ময়কর বিষয় এবং উম্মতের জন্য মহান সৌভাগ্য যে, উম্মতের কাছে প্রিয় নবীজী (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)-এর জীবনের সম্পূর্ণ রেকর্ড সুরক্ষিত রয়েছে। উম্মত নবী (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)-এর জীবনের প্রত্যেকটি ঘটনার বাস্তবতা দলীল প্রমাণ সহ চিহ্নিত করতে পারবে। বর্তমান পৃথিবীতে কোন জাতির কাছেই তাদের ধর্মগুরুর বিশুদ্ধ ও প্রমাণপুষ্ট জীবনী সংরক্ষিত নেই।

নবী (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)-এর পবিত্র জীবনী বর্ণনা করার দু'টি পদ্ধতি আছে। প্রথম, নবীর পবিত্র জীবনের প্রত্যেকটি আচার ব্যবহার ও ভাবভঙ্গি অর্থাৎ প্রত্যেকটি সুন্নত নিজ জীবনে এমনভাবে অনুসরণ করতে হবে যাতে আকৃতি-প্রকৃতিতে, চাল-চলনে, কথাবার্তায়, স্বভাব চরিত্রে নবীর আদর্শ প্রতিফলিত হয়। দ্বিতীয় পদ্ধতি এই যে, প্রত্যেক সভায় ও বৈঠকে, জমায়েত ও অধিবেশনে, বায়ান ও বক্তৃতায় নবীর জীবনী নিয়ে আলোচনা করা হবে।

রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)-এর পবিত্র যুগে, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন ও তাবয়ে তাবেয়ীনদের যুগে, তারপর ইমাম ও মুহাদ্দেসীনদের যুগে এবং আজও পর্যন্ত সারা মুসলিম বিশ্বের নবী প্রেমিক দ্বীনদার ব্যক্তিগণ উপরোক্ত দু'টি

পদ্ধতিতেই 'মীলাদুন নবী' পালন করে আসছেন। এই ভাবে 'মীলাদুন নবী' পালন করা জায়েয ও বিরাট সওয়াবের কাজ হওয়া সম্পর্কে কারো কোনো দ্বিমত নেই।

প্রচলিত মীলাদুন নবী

প্রচলিত মীলাদুন নবী বলতে বোঝায়, অন্যান্য ধর্মানুসারীরা যেভাবে তাদের ধর্মগুরুদের জন্মদিবস পালন করে সেই ভাবে রসূল (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)-এর জন্মদিবস পালন করা। অর্থাৎ বছরের একটা দিন (১২ই রবিউল আউওয়াল) নির্দিষ্ট করে সেই দিন লোকদেরকে একত্রিত করে নবী (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)-এর জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করা, শৈশবের ঘটনাবলী বর্ণনা করা, কিয়াম করা, মাহফিল শেষে শিরনি দেওয়া, এ উপলক্ষে মিছিল বার করা, ঘরবাড়ি ও মসজিদ লাইট ইত্যাদি দিয়ে সাজানো।

এ বিষয়ে আমাদের জেনে রাখা দরকার যে, এই ভাবে বছরের একটা নির্দিষ্ট মাসে বা দিনে 'মীলাদুন নবী' বা নবীর জীবন নিয়ে আলোচনা বা নবীর জন্মদিবস পালন করার প্রথা রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)-এর ২৩ বছর নবুওয়াতের যুগে ছিল না, এরপর ১১ হিজরী থেকে ৪০ হিজরী প্রায় ৩০ বছর খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগেও ছিল না, এরপর প্রায় ১২০ হিজরী পর্যন্ত সাহাবায়ে কেরামের যুগেও ছিল না, এরপর কমবেশি ২২০ হিজরী পর্যন্ত তাবেয়ীন, তাব্‌য়ে তাবেয়ীন ও আইম্মায়ে মুজতাহেদীনের যুগেও ছিল না, এরপর প্রায় ৪০০ হিজরী পর্যন্ত ফুক্বাহা ও মুহাদ্দেসীনের যুগেও ছিল না, অতঃপর আরো ৬০৩ হিজরী পর্যন্ত তৎকালীন উলামায়ে কেরামের যুগেও আহলে সুন্নত অল জামাতের মাঝে এই প্রচলিত মীলাদের বা নবীর জন্মদিবস পালনের কোন অস্তিত্ব ছিল না। প্রচলিত মীলাদ পালনকারীরাও এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, এই প্রচলিত মীলাদের কোন অস্তিত্ব ৬০৩ হিজরীর পূর্বে ছিল না।

প্রচলিত মীলাদের উৎপত্তি ও ইতিহাস

মিশরের বিখ্যাত মুফতী, বহু গ্রন্থ প্রণেতা শাইখ মুহাম্মদ বাখীত (মৃত্যু- ১৩৫৪ হিঃ) 'আহসানুল কালাম ফীমা ইয়াতায়াল্লাকু বিস্ সুন্নতি অল বিদআতে মিনাল আহকাম' (৬০ পৃষ্ঠা) কিতাবে এবং তাক্বিউদ্দীন আল্ মাক্বরেযী (মৃত্যু- ৮৪৫ হিঃ) 'আল্ মাওয়ায়িয্ অল্ ই'তিবার' গ্রন্থে ২/৩৩৩ মীলাদের সূচনা সম্পর্কে লিখেছেন, ''৩৬২ হিজরীতে মিসরের ফাতেমী শিয়া শাসক 'আল্ মুয়িয্ লিদীনিল্লাহ্' (মৃত্যু- ৩৬৫ হিঃ) সর্বপ্রথম মুসলমানদের মধ্যে জন্মবার্ষিকী পালনের রীতি চালু করেন। তিনি ছয়টি জন্মদিবস পালন করা শুরু করেছিলেন। রসূলুল্লাহ্

(স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)-এর, হজরত আলী (রাজিঃ)-এর, হজরত ফাতিমা (রাজিঃ) -এর, হজরত হাসান (রাজিঃ)-এর, হজরত হুসাইন (রাজিঃ)-এর এবং সমকালীন খলীফার। পরবর্তীতে মিশরের শাসক 'আফজাল ইবনে আমীরিল জুয়ূস' (মৃত্যু- ৫১৫ হিঃ) তাঁর শাসনকালে (৪৮৭ হিজরী হতে ৫১৫ হিজরী পর্যন্ত) ওই সমস্ত জন্মবার্ষিকী পালন বন্ধ করে দেন। তারপর খলীফা 'আ-মির বিআহ্কামিল্লাহ্' (মৃত্যু- ৫২৪ হিঃ) তাঁর খিলাফত যুগে পুনরায় ওই সমস্ত জন্মবার্ষিকী পালন ফিরিয়ে আনেন এবং বড় জাঁকজমকের সাথে ঘটা করে তা পালন হতে থাকে। কিন্তু এই জন্মবার্ষিকী পালনের অনুষ্ঠান শিয়াদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।''

জালালুদ্দীন সুয়ূতী (মৃত্যু- ৯১১ হিঃ) লিখেছেন, এই প্রচলিত মীলাদ (আহলে সুন্নত অল্ জামাতের মধ্যে) সর্বপ্রথম শুরু করেছিলেন, ইরবিলের শাসক বাদশাহ আবু সাঈদ মুযাফ্ফার কূকুবূরী বা কাওকাবূরী ① (মৃত্যু-৬৩০হিঃ)। (হুস্নুল মাকসাদ ফী আমালিল্ মাওলিদ- ৪২ পৃষ্ঠা) বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে খাল্লিকান (মৃত্যু-৬৮১ হিঃ) বাদশাহ আবু সাঈদ মুযাফ্ফারুদ্দীনের রবীউল আউওয়াল মাসে রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)-এর জন্মবার্ষিকী পালন অনুষ্ঠানের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। তবে তিনি লিখেছেন যে, বাদশাহ্ মুযাফ্ফারুদ্দীন এক বছর ৮ই রবীউল আউওয়াল জন্মদিন পালন করতেন আর পরের বছর ১২ই রবীউল আউওয়াল জন্মদিন পালন করতেন। (অফাইয়াতুল আ'ইয়ান- ৪/১১৮)

'ইবনে খাল্লিকান' আরও লিখেছেন, 'আবুল খত্তাব ইবনে দিহ্ইয়া কালবী (মৃত্যু- ৬৩৩ হিঃ) খুরাসান যাওয়ার পথে ৬০৪ হিজরীতে যখন ইরবিল শহরে পৌঁছলেন, তখন সেখানে নবী (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)-এর জন্মদিবসের অনুষ্ঠান দেখে এ সম্পর্কে 'কিতাবুত্ তানবীর ফী মাওলিদিস্ সিরাজিল মুনীর' নামে একটি কিতাব লিখে ৬২৫ হিজরীর জুমাদাল আখিরা মাসে ছয়টি মজলিসে বাদশাহ্ মুযাফ্ফারুদ্দীনকে শোনান। বাদশাহ তাতে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা দান করেন।' (অফাইয়াতুল আ'ইয়ান- ৩/৪৪৯)

এই দরবারী আলেম 'আবুল খত্তাব ইবনে দিহ্ইয়া কালবী' (ইনিই সর্বপ্রথম প্রচলিত মীলাদের সমর্থনে কিতাব লিখেছেন।) সম্পর্কে ইবনে হাজার আসক্বলানী লিখেছেন, 'এই 'আবুল খত্তাব ইবনে দিহ্ইয়া' নিজেকে সাহাবী 'দিহ্ইয়া কালবী (রাজিঃ)-এর বংশধর বলে দাবি করতো, অথচ তার এই দাবি

① وكوكبورى:بضم اوبفتح الكافين بينهما واو ساكنة ثم باء موحدة مضمومة ثم واو ساكنة و بعدها راء، وهو اسم تركى معناه بالعربى : ذئب ازرق

সম্পূর্ণ মিথ্যা।' অতঃপর ইবনে হাজার (রহঃ) তার দাবি মিথ্যা হওয়ার তিনটি কারণ উল্লেখ করেছেন। তিনি আরও লিখেছেন,

قال ابن النجار: رأيت الناس مجتمعين على كذبه و ضعفه

অর্থ- ইবনুন্ নাজ্জার বলেছেন, আমি লোকদেরকে দেখেছি যে, তারা সকলে ইবনে দিহ্ইয়ার মিথ্যাবাদী ও অযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে একমত।

ইবনে হাজার (রহঃ) ইবনে দিহ্ইয়া সম্পর্কে আরও লিখেছেন,

كثير الوقيعةفى الائمة و فى السلف من العلماء خبيث اللسان أحمق شديد الكبر قليل النظر فى أمور الدين متهاونا

অর্থাৎ- ইবনে দিহ্ইয়া ইমামগণ ও পূর্ববর্তী উলামাদের সম্পর্কে খুব কটূক্তি করতো, অশ্লীলভাষায় কথাবার্তা বলতো, নির্বোধ, দাম্ভিক ও অহংকারী ছিলো, দ্বীনী বিষয়ে নির্বোধ ও অবহেলাকারী ছিলো। (লিসানুল মীযান-৪/২৯৬)

হজরত মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ লুধিয়ানবী (মৃত্যু- ১৪২১ হিঃ) লিখেছেন, প্রচলিত মীলাদ মাহফিল সর্বপ্রথম শুরু করেছিলেন বাদশাহ আবু সাঈদ মুযাফ্ফার এবং আবু খত্তাব ইবনে দিহ্ইয়া ৬০৪ হিজরীতে। (ইখতেলাফে উম্মত- ৯৯ পৃষ্ঠা) এছাড়া মীলাদের ইতিহাস সম্পর্কে প্রখ্যাত আলিম ও বহু গ্রন্থের প্রণেতা মাওলানা ক্বারী আব্দুর রশীদ তাঁর 'মুরাওঅজা মাহফিলে মীলাদ' গ্রন্থে প্রচলিত মীলাদ সমর্থক উলামাদের কিতাব হতে প্রমাণ করেছেন যে, প্রচলিত মীলাদ মহফিলের সূচনা ৬০৪ হিজরীতে হয়েছিল। (৫২ পৃষ্ঠা)

মাওলানা ক্বারী আব্দুর রশীদ সাহেব আরও লিখেছেন, বাদশাহ আবু সাঈদ ও ইবনে দিহ্ইয়া যে মীলাদ চালু করেছিলেন তাতে 'কিয়াম' ছিলোনা। মীলাদের মধ্যে কিয়ামের প্রথা আরো ১৫০ বছর পর 'তাক্বিউদ্দীন সুবকী (মৃত্যু-৭৫৬হিঃ)-এর যুগে হয়েছিল। (মুরাওঅজা মাহফিলে মীলাদ-৫৩)

প্রচলিত মীলাদের কথিত দলীল

প্রচলিত মীলাদ যেহেতু একটি নব আবিষ্কৃত প্রথা, তাই এর সপক্ষে কোন দলীল-প্রমাণ কুরআন ও হাদীসে থাকতে পারে না। কুরআন ও হাদীসে যদি এর আদেশ থাকতো তাহলে রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এবং সাহাবায়ে কেরাম অবশ্যই তার উপর আমল করতেন। কেননা সাহাবায়ে কেরাম হতে বেশি কুরআন ও হাদীস অনুসারী এবং তাঁদের থেকে বড় আশিকে রসূল ও নবী প্রেমিক কেউ হতে পারেনি আর পারবেও না।

তা সত্বেও প্রচলিত মীলাদ প্রমাণ করার জন্য জোরপূর্বক যে সমস্ত আয়াত ও হাদীস পেশ করা হয়, আমি প্রচলিত মীলাদ সমর্থকদের কিতাব (জা-য়াল্ হক,

১৯০ পৃষ্ঠা) হতে তা পাঠকের সামনে অর্থসহ তুলে ধরলাম। পাঠকেই বিচার করবেন যে এই আয়াত ও হাদীসগুলির প্রচলিত মীলাদের সাথে কী সম্পর্ক আছে? قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَ آخِرِنَا وَ آيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

১) ঈসা ইবনে মরইম (আলাইহিস্ সালাম) বললেন, হে আল্লাহ, আমাদের পালনকর্তা! আমাদের প্রতি আকাশ থেকে খাদ্যভর্তি খাঞ্চা অবতারণ করুন। তা আমাদের জন্য অর্থাৎ আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবার জন্য আনন্দোৎসব হবে এবং আপনার পক্ষ থেকে একটি নিদর্শন হবে। আপনি আমাদের রুযী দিন, আপনিই শ্রেষ্ঠ রুযীদাতা। (সূরা মায়িদা, আয়াত নং-১১৪)

وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

২) আল্লাহর সেই অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো যা তোমাদের উপর রয়েছে। (সূরা বাক্বারা, আয়াত নং-২৩১)

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

৩) এবং আপনার পালনকর্তার নিয়ামতের কথা প্রকাশ করুন। (সূরা যুহা, আয়াত নং-১১)

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ

৪) আল্লাহ ঈমানদারদের উপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদের মাঝে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে নবী পাঠিয়েছেন। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত নং-১৬৪) لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

৫) তোমাদের কাছে এসেছেন তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রসূল। তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তার পক্ষে দুঃসহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়। (সূরা তাওবা, আয়াত নং-১২৮)

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ

৬) তিনিই প্রেরণ করেছেন আপন রসূলকে হিদায়েত ও সত্য দ্বীন সহকারে যেন এ দ্বীনকে অপরাপর দ্বীনের উপর জয়যুক্ত করেন। (সূরা তাওবা, আয়াত নং-৩৩)

পাঠকবৃন্দ! আপনারা অবশ্যই বুঝতে পারছেন যে, এই সমস্ত আয়াতের প্রচলিত মীলাদের সাথে কোন সম্পর্কই নেই।

প্রচলিত মীলাদের সমর্থক মুফতী আহমাদ ইয়ার খান নয়ীমী (মৃত্যু-

১৩৯১হিঃ) 'জা-য়াল হক' কিতাবে লিখেছেন, ''কলমা ত্বইয়েবার মধ্যে মীলাদ শরীফ আছে। (১৯১ পৃষ্ঠা) সমস্ত নবীরা তাঁদের উম্মতকে শেষ নবীর আগমনের সুসংবাদ দিয়েছেন। অতএব বোঝা গেল যে, মীলাদ পড়া সমস্ত নবীদের সুন্নত। রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) সাহাবাদের মাহফিলে মিম্বারে দাঁড়িয়ে নিজ জন্মবৃত্তান্ত ও নিজ গুণাবলী বর্ণনা করেছেন। অতএব বোঝা গেল যে, মীলাদ পড়া রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)-এর সুন্নত। (১৯২ পৃষ্ঠা) সাহাবারা একে অপরকে বলতেন যে, রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)-এর গুণাবলী শোনাও। অতএব বোঝা গেল যে, মীলাদ পড়া সাহাবাদেরও সুন্নত।'' (১৯৩ পৃষ্ঠা)

সুধী পাঠকবৃন্দ! কলমা ত্বইয়েবা পড়া, শেষ নবীর আগমনের সুসংবাদ দেওয়া, রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)-এর জন্মবৃত্তান্ত ও গুণাবলী বর্ণনা করা যদি মীলাদ হয় তাহলে তার জন্য মাস ও দিন নির্দিষ্ট করার কি প্রয়োজন? এ ধরণের মীলাদ তো আমরা প্রতিদিন করছি।

আমরা পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করেছি যে, নবীজী (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)-এর পবিত্র জীবনী নিয়ে আলোচনা করা, তার জীবনের ঘটনাবলী বলা ও শোনা, তাঁর স্মৃতিচারণ করা উচ্চ পর্যায়ের ইবাদত বরং ইবাদতের প্রাণ। এ বিষয়ে কোন বিরোধ নেই। এ মীলাদ তো ইসলামের শুরু থেকেই চলে আসছে। আমাদের আপত্তি তো সেই মীলাদ নিয়ে যা ৬০০ হিজরীর পর শুরু হয়েছে, যাকে 'প্রচলিত মীলাদ' বলা হচ্ছে। এই 'প্রচলিত মীলাদ'-এর কোন প্রমাণ না কুরআন শরীফে আছে, আর না হাদীস শরীফে আছে।

'প্রচলিত মীলাদ' প্রমাণ করার জন্য বিশেষ ভাবে দু'টি হাদীস পেশ করা হয়। ১) বুখারী শরীফে আছে, আবু লাহাব যখন মারা গেল, তার একজন আত্মীয় তাকে স্বপ্নে দেখলো যে, সে ভীষণ কষ্টের মধ্যে আছে। তাকে জিজ্ঞেস করলো, তোমার সাথে কেমন ব্যবহার করা হয়েছে? আবু লাহাব বললো, যখন থেকে তোমাদের হতে দূরে আছি, তখন থেকেই ভীষণ কষ্টে আছি। কিন্তু সুয়াইবাকে আযাদ করার কারণে কিছু পানি পান করতে পারছি। (হাদীস নং-৫১০১) এই হাদীস দ্বারা প্রমাণ হয় যে, রসূল (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)-এর জন্মগ্রহণের ওপর আনন্দ প্রকাশ জায়েয ও বরকতের কারণ। কেননা আবু লাহাব রসূল (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)-এর জন্মগ্রহণের ওপর আনন্দিত হয়ে সুয়াইবাকে আযাদ করার কারণে তার আযাব লাঘব হয়েছিল।

এর উত্তরে আমরা বলবো, রসূল (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)-এর জন্মগ্রহণের ওপর আনন্দিত হওয়া তো ঈমানের লক্ষণ। এমন কোন মুসলমান নেই যে

রসূল (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)-এর জন্মগ্রহণের ওপর আনন্দিত হয় না। আমরা রসূল(স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)-এর জন্মের ওপর বছরে একবার নয়, প্রতি মুহূর্তেই আনন্দ বোধ করি। আমাদের আপত্তি তো সেই বিশেষ পদ্ধতি সম্পর্কে যা নিজেরা আবিষ্কার করে রেখেছে। প্রচলিত মীলাদ পদ্ধতিও কি উল্লিখিত ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হয়?

২) মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে, ''রসূল (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) প্রতি সোমবার রোযা রাখতেন, কেননা সোমবার তাঁর জন্মদিন।'' অতএব বোঝা গেলো যে, জন্মদিন পালন করা চলবে। এর উত্তরে আমরা বলবো, এই হাদীস দ্বারা দু'টি বিষয় জানা গেলো, প্রথম- রসূল (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) জন্মবার্ষিকী পালন করতেন না, তিনি জন্মসাপ্তাহিকী পালন করতেন। দ্বিতীয়, রোযা রাখার মাধ্যমে জন্মদিন পালন করা। এই জন্যেই আমরাও বলি যে, রসূল (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)-এর জন্মের ওপর শুকরিয়া আদায় করার জন্য প্রতি সোমবার রোযা রাখা সুন্নত। জন্মবার্ষিকী পালন করার সাথে বা প্রচলিত মীলাদের সাথে এই হাদীসের কোন সম্পর্ক নেই।

বিঃদ্রঃ- এই হাদীস দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায় যে, রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)-এর জন্মদিন 'ঈদের দিন' হতে পারে না। কেননা রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ঈদের দিন রোযা রাখতে কঠোর ভাবে নিষেধ করেছেন। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং- ১৯৯০, মুসলিম শরীফ, হাদীস নং- ১১৩৭) সুতরাং রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)-এর জন্মদিন যদি ঈদের দিন হতো তাহলে তিনি জন্মদিনে রোযা রাখতেন না।

ঈদে মীলাদুন নবী বলা কি জায়েয

রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য জুময়ার দিনকে (সপ্তাহের) ঈদের দিন বানিয়েছেন। (মাজমায়ুয যাওয়ায়েদ, হাদীস নং-৩০৪৮) অন্য এক হাদীসে আছে, হজরত আনাস (রাজিঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) মদীনায় আগমন করলেন,আর তখন তাদের এমন দু'টি দিন ছিলো যাতে তারা খেলাধুলা করতো। রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের এ দু'টি দিন কী? তারা বলল, ইসলাম-পূর্ব জাহেলিয়াত যুগে এতে আমরা খেলাধুলা করতাম। রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বললেন, আল্লাহ তায়ালা সে দু'দিনের পরিবর্তে সে দু'দিন অপেক্ষা উত্তম দু'টি দিন তোমাদেরকে দান করেছেন। ঈদুল আযহা এবং ঈদুল ফিতর।

(আবু দাউদ শরীফ, হাদীস নং-১১৩৪) রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) শুধু দু'টি ঈদের ঘোষণা দিয়েছেন। সুতরাং এ দুই ঈদ ব্যতীত তৃতীয় কোন ঈদ সাব্যস্ত করা শরীয়তের সুস্পষ্ট লঙঘন এবং শারয়ী বিধানে বিকৃতির শামিল।

প্রকাশ থাকে যে, ৬০০ হিজরীর পর যখন ১২ই রবীউল আউওয়াল রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)-এর জন্মদিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠান শুরু হয় তখন তার নাম হয় 'মীলাদুন নবী'র দিন বা ১২ অফাতের দিন। মীলাদুন নবীর সাথে তখন 'ঈদ' শব্দটি ব্যবহার হতো না। মীলাদুন নবীর সাথে 'ঈদ' শব্দটির ব্যবহার শুরু হয় গত শতাব্দিতে। বেরেলী আলেম মুহাম্মদ নূর বাখ্শ্ তাওয়াক্কুলী (মৃত্যু-১৩৬৭হিঃ) মীলাদুন নবীর সাথে 'ঈদ' শব্দটি যোগ করেন। এই বিষয়টি বেরেলী আলেমদেরই দু'টি কিতাবে লেখা আছে। (দেখুন- তাযকিরা আকাবিরে আহলে সুন্নত-৫৫৯ পৃষ্ঠা এবং তাযকিরা সাইয়েদিনা গওসে আ'যম কিতাবের ভূমিকা- ৮ পৃষ্ঠা)

জন্মরাত কি শবে ক্বদর থেকে উত্তম?

বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) দিনের বেলা জন্মগ্রহণ করেছিলেন। (শারহুয যুরক্বানী-১/২৫৪) এই মত মেনে নিলে শবে ক্বদরের সাথে আর তুলনাই আসবে না। কেননা শবে ক্বদর হয় রাতের বেলা আর রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)-এর জন্ম হয়েছে দিনের বেলা।

যদি আমরা মেনে নিই যে, রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) রাতের বেলা জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাহলে প্রশ্ন হয় যে, জন্মরাত উত্তম না শবে ক্বদর উত্তম? এ বিষয়ে সর্বপ্রথম জানা দরকার, সমস্ত উলামায়ে কেরাম একমত যে, শবে ক্বদর সম্পর্কে কুরআন শরীফে একটি স্বতন্ত্র সূরা আছে এবং বহু সহি হাদীসে শবে ক্বদরের আমল ও ফজীলত বর্ণিত আছে। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)-এর জন্মরাত সম্পর্কে না কুরআন শরীফে কিছু আছে, না এ সম্পর্কে কোন হাদীস বর্ণিত আছে।

আল্লামা ক্বসত্বলানী (মৃত্যু-৯২৩হিঃ) 'আল মাওয়াহিবুল্ লাদুন্নিয়া' কিতাবে এবং আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী (মৃত্যু-১০৫২হিঃ) 'মা সাবাতা বিস্ সুন্নাহ' কিতাবে তিনটি কারণে রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)-এর জন্মরাতকে শবে ক্বদর থেকে উত্তম বলেছেন। ১) উক্ত জন্মরাত স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)-এর আগমনের রাত। আর শবে ক্বদর তো তাকেই দেওয়া হয়েছে। আর একথা পরিস্কার, যে রাত রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)-এর জাত মুবারক দ্বারা মর্যাদাশালী হয়েছে সেটি ওই রাত অপেক্ষা অবশ্যই উৎকৃষ্ট

বিবেচিত হবে, যেটি রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)কে প্রদান করার কারণে মর্যাদাশালী হয়েছে। ২) শবে ক্বদর ফেরেশতাগণের অবতীর্ণ হওয়ার কারণে সম্মানিত হয়েছে, আর জন্মরাত স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)-এর আগমন দ্বারা সম্মানিত হয়েছে। ৩) শবে ক্বদরের মধ্যে রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) -এর উম্মতের জন্য অনুগ্রহ রয়েছে, কিন্তু জন্মরাতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা সমগ্র সৃষ্টির উপরই পরম অনুগ্রহ করেছেন।

কিন্তু মুহাক্কিক ও গবেষক উলামাগণ এর প্রতিবাদ করেছেন। বিখ্যাত মুহাদ্দিস এবং 'আল মাওয়াহিবুল্ লাদুন্নিয়া'র ভাষ্যকার আল্লামা যুরক্বানী (মৃত্যু-১১২২হিঃ) লিখেছেন, রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)-এর জন্মরাতকে যে শবে ক্বদর থেকে উত্তম বলা হয়েছে, তার অর্থ যদি এই হয় যে, প্রতি বছর ওই রাত (অর্থাৎ ১২ই রবীউল আউওয়ালের রাত) শবে ক্বদর থেকে উত্তম। তাহলে, যে তিনটি কারণে জন্মরাতকে উত্তম বলা হচ্ছে তা একবারই পাওয়া গেছে, প্রতি বছর পাওয়া যায় না। অতএব প্রতি বছর ওই রাতকে শবে ক্বদর থেকে উত্তম বলার অবকাশ নেই।

আর যদি এই অর্থ হয়, যে রাতে রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)-এর জন্ম হয়েছিল সেই রাতটি শবে ক্বদর থেকে উত্তম। তাহলে এটাও বলা যাবে না, কেননা তখন শবে ক্বদরের কোন অস্তিত্ব ছিলো না। রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) জন্মের বহু যুগ পর বলেছেন যে, সমস্ত রাতের মধ্যে শবে ক্বদর সর্বোত্তম, এ সম্পর্কে বহু সহি হাদীসও বর্ণিত হয়েছে। অতএব জন্মের রাতকে শবে ক্বদরের সাথে তুলনা করাই অযৌক্তিক। তাছাড়া উক্ত জন্মরাত বিগত হয়ে গেছে (আর কোন দিন আসবে না) আর শবে ক্বদর আজও আছে (এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে)। রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) স্পষ্ট ভাষায় শবে ক্বদরের বহু ফজীলত বর্ণনা করেছেন কিন্তু জন্মরাত সম্পর্কে কোন কিছুই বলেননি। তাই আমাদের জন্য আবশ্যক যে, হাদীসে যা বর্ণিত আছে তা যথেষ্ট মনে করা এবং নিজেদের পক্ষ হতে কোন কিছু আবিষ্কার না করা। (শারহুয যুরক্বানী-১/২৫৬) মুল্লা আলী ক্বারী (মৃত্যু-১০১৪হিঃ) লিখেছেন, বহু বিশুদ্ধ ও স্পষ্ট হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, শবে ক্বদর সমস্ত রাত হতে উত্তম এবং কুরআন শরীফেও এর প্রমাণ রয়েছে। (মিরক্বাত-৩/১০১৮)

মীলাদের ফজীলত সম্পর্কে ভিত্তিহীন হাদীস

আমরা পূর্বে বলেছি যে, রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)-এর যুগ হতে

৬০০ হিজরী পর্যন্ত মীলাদের কোন অস্তিত্ব ছিলো না, সুতরাং মীলাদের ফজীলত সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) হতে, সাহাবা, তাবেয়ীন তথা ৬০০ হিজরীর পূর্বের কোন আলেম হতে কোন হাদীস বা উক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু ইবনে হাজার হাইসামী (মৃত্যু-৯৭৪ হিঃ) 'আন্ নি'মাতুল কুব্‌রা আলাল্ আলামি ফী মাওলিদি সাইয়িদি অলাদি আদম' নামক কিতাবে ৫,৬ ও ৭ পৃষ্ঠায় খুলাফায়ে রাশেদীন হজরত আবু বকর, উমর, উসমান ও আলী (রাজিঃ) থেকে এবং হাসান বাসারী, মা'রুফ কারখী প্রমুখ উলামা হতে মীলাদ পড়া, মীলাদে খরচ করা ইত্যাদি সম্পর্কে বিরাট বড় বড় ফজীলতের কথা উল্লেখ করেছেন।

এ সম্পর্কে জানা দরকার যে, ইবনে হাজার হাইসামী উক্ত কিতাবে খুলাফায়ে রাশেদীন এবং অন্যান্য উলামা হতে মীলাদ পড়া, মীলাদে খরচ করা ইত্যাদি সম্পর্কে যেসব ফজীলতের কথা লিখেছেন তার কোন সনদ বা সূত্র উল্লেখ করেননি। বিনা সনদে কোন কথা গ্রহণযোগ্য হতে পারেনা।

আরবের বিখ্যাত আলিম মাহমূদ সালিম মুহাম্মদ 'আল্ মাদায়িহুন্ নববিইয়্যা' ১/১৯১ কিতাবে লিখেছেন,"মীলাদ সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেয়ীনদের থেকে যা কিছু বর্ণনা করা হয় সব মনগড়া ও ভিত্তিহীন। যেমন ইবনে হাজার হাইসামী এ সম্পর্কে খুলাফায়ে রাশেদীন থেকে যা কিছু বর্ণনা করেছেন সবই ভিত্তিহীন।" তাছাড়া যে বিষয়টি সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেয়ীনদের যুগে ছিলনা তাঁরা সেই বিষয়ের ফজীলত কী ভাবে বর্ণনা করতে পারেন?

সারকথা, মীলাদ-সম্পর্কে লিখিত বিভিন্ন কিতাবে মীলাদের যে সমস্ত ফজীলতের কথা বলা হয়েছে সব মনগড়া, কুরআন ও হাদীসে তার কোন প্রমাণ নেই। বেরেলী আলিম সৈয়দ আহমদ সাঈদ কাযমী (মৃত্যু-১৪০৬হিঃ) তাঁর রচিত 'মীলাদুন্নবী (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)" কিতাবে ৫৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, 'মীলাদ মাহফিলের বৈশিষ্টসমূহ হতে একটি অতিব সত্য বৈশিষ্ট হচ্ছে, যে বছর এই মীলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়, ঐ গোটা বছরই পরম নিরাপদে অতীত হয়।' পাঠকবৃন্দ! এই বিষয়টি ২০২০ ও ২০২১ সালের বাস্তবের সাথে মিলিয়ে দেখার অনুরোধ রইলো।

প্রচলিত মীলাদ কি বিদআতে হাসানা?

প্রচলিত মীলাদ মহফিলকে অনেকে 'বিদআতে হাসানা' বা ভালো বিদআত বলে থাকেন। এ বিষয়ে জানা দরকার যে, অধিকাংশ উলামাদের মতে

বিদআতের মধ্যে ভালো-মন্দ কিছু হয় না। সমস্ত বিদআতই মন্দ, কেননা রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, كل بدعة ضلالة 'প্রত্যেক বিদআতই পথভ্রষ্টতা।' (মুসলিম শরীফ, হাদীস নং-৮৬৭) তবে কিছু উলামা বিদআতকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। তাঁদের মতে দ্বীনের সাথে সম্পৃক্ত নতুন আবিষ্কৃত বিষয়গুলো -যাকে আভিধানিক অর্থে বিদআত বলা হয়- দু'ধরণের হয়ে থাকে। একটি হচ্ছে এমন যা দ্বীনের জন্য সহযোগীর ভূমিকা পালন করে। যেমন পবিত্র কুরআনকে একত্রিত করা, দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা ইত্যাদি। এগুলো বিদআতে হাসানা তথা ভালো বিদআত। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে 'দ্বীনের মধ্যে' নতুন কিছু আবিষ্কার করা। যেমন প্রচলিত মীলাদ মহফিল করা, জন্মদিবস ও মৃত্যুদিবস পালন করা, কুলখানি করা ইত্যাদি। এগুলো বিদআতে সাইয়িয়্যা তথা মন্দ বিদআত। 'দ্বীনের জন্য আবিষ্কার' (যাকে বিদআতে হাসানা বলা হয়) আর 'দ্বীনের মধ্যে আবিষ্কার' (যাকে বিদআতে সাইয়িয়্যা বলা হয়)-এর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, প্রথমটি দ্বীনের সহযোগিতা, হেফাজত ও সংরক্ষণের জন্য করা হয়। আর দ্বিতীয়টি সহযোগিতার জন্য নয় বরং প্রবৃত্তির অনুসরণ কল্পে দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু সংযোজন করা হয়। প্রথমটি মুসলমানদের অন্তরে দ্বীনের মর্যাদা ও শানকে বাড়িয়ে দেয়, আর দ্বিতীয়টি বিদআতিদের অন্তরে দ্বীনের মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত করে। দ্বিতীয়টির কারণে সুন্নত বিলুপ্ত হয়ে যায়। যেমন রসূলুল্লাহ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, ما احدث قوم بدعة الا رفع مثلها من السنة 'কোন সম্প্রদায় বিদআতে লিপ্ত হলে বিদআত সমপরিমাণ সুন্নত বিলুপ্ত হয়ে যায়।' (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-১৬৯৭০) আর প্রথমটি সুন্নতকে স্ব-স্থানে টিকিয়ে রাখার ভূমিকা পালন করে। (সংগৃহীত, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া-৩/৩৩, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া-২/৪১, ফাতাওয়া ক্বাসিমিয়্যা-২/৪২৭)

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে সুন্নতের উপর আমল করার এবং বিদআত থেকে বাঁচার তৌফিক দান করুন। আমীন

এ মাসের স্মরণীয় ঘটনাসমূহ

গযওয়া বুওয়াত। ২য় হিজরীর এই মাসে (সেপ্টেম্বর- ৬২৩খ্রিঃ) হজরত সা'দ ইবনে মুয়ায্ (রাজিঃ)কে মদীনার আমীর নিযুক্ত করে রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ২০০ সাহাবা নিয়ে কাফেরদের মোকাবিলা করার জন্য 'বুওয়াত' নামক স্থান পর্যন্ত গিয়েছিলেন। কিন্তু এই সফরে শত্রুদের সাথে সামনা সামনি কোন যুদ্ধ হয়নি। এটি ইতিহাসে 'গযওয়া বুওয়াত' নামে প্রসিদ্ধ। (আর রহীকুল মাখতূম- ২৭২ পৃষ্ঠা)

গাযওয়া সাফওয়ান। এই বছরের এই মাসেই রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) সংবাদ পেলেন যে, কুর্য্ ইবনে জাবির ফিহ্রী (একজন কাফির) তার দলবল নিয়ে মদীনার চারণভূমি থেকে মুসলমানদের ছাগল, ভেড়া, উট ইত্যাদি পশু লুঠ করে নিয়ে পালাচ্ছে। রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) যায়েদ ইবনে হারিসা (রাজিঃ)কে মদীনার আমীর নিযুক্ত করে ৭০ জন সাহাবা নিয়ে তাদের তাড়া করে বদরের কাছাকাছি সাফওয়ান উপত্যকা পর্যন্ত গিয়েছিলেন। কিন্তু তাদেরকে ধরতে পারা যায়নি। এই গাযওয়াকে 'বদরে উলা' বা প্রথম বদরও বলা হয়ে থাকে। (আর রহীকুল মাখতূম- ২৭২ পৃষ্ঠা)

৩য় হিজরীর এই মাসেই হজরত উসমান গণী (রাজিঃ) সাথে রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)-এর কন্যা হজরত উম্মে কুলসুম (রাজিঃ) এর বিবাহ হয়। (শারহে যুরক্বানী- ৪/৩২৭)

এই বছরের এই মাসের ১৪ তারিখে রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)-এর তথা ইসলামের বিখ্যাত শত্রু ইহুদী কা'ব ইবনে আশরাফকে হত্যা করা হয়। (আর রহীকুল মাখতূম- ৩৩৩ পৃষ্ঠা)

গাযওয়া বনূ নাযীর- ৪র্থ হিজরীর এই মাসে 'গাযওয়া বনূ নাযীর' হয়েছিল। বনূ নাযীর মদীনায় বসবাসকারী এক ইহুদী গোত্র ছিল। যারা বারবার মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। এমনকি তারা রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে হত্যার ষড়যন্ত্রও করেছিল। যার কারণে রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) হজরত ইবনে উম্মে মাকতূম (রাজিঃ) কে মদীনার আমীর নিযুক্ত করে সাহাবাদের নিয়ে বনূ নাযীরদের দূর্গ অবরোধ করেন। ছয় দিন অথবা ১৫ দিন অবরুদ্ধ থাকার পর ইহুদীরা পরাজয় স্বীকার করলে তাদেরকে মদীনা থেকে বিতাড়িত করা হয়।

গযওয়া দুমাতুল জুনদাল- ৫ম হিজরীর এই মাসে রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বিভিন্ন সূত্রে সংবাদ পান যে, সিরিয়ার নিকটবর্তী 'দুমাতুল জুনদাল' নামক

স্থানের বাসিন্দারা মদীনা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। রসূল (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) হজরত সেবা' ইবনে আরফাতাহ্ (রাজিঃ) কে মদীনার দায়িত্ব দিয়ে এক হাজার সাহাবা নিয়ে এই মাসের ২৫ তারিখে মদীনা থেকে রওয়ানা হন। মুসলমানদের আগমনের খবর পেয়ে শত্রুরা পালিয়ে যায়। রবীউল আখির মাসের ২০ তারিখে মুসলিম সৈন্য বাহিনী মদীনায় ফিরে আসে। (শারহুয্ যুরক্বানী- ২/৫৪০)

গযওয়া যাতুর রিক্বা। ৭ম হিজরীর এই মাসেই 'গযওয়া যাতুর রিক্বা' হয়। রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) সংবাদ পেলেন যে, বনূ সালাবা এবং বনূ মাহারিব মদীনা আক্রমণ করার জন্য এক স্থানে একত্রিত হচ্ছে। এই সংবাদ পেয়ে রসূলুল্লাহ্ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) হজরত আবু যার (রাজিঃ) অথবা হজরত উসমান গণী (রাজিঃ) কে মদীনার দায়িত্ব দিয়ে ৪০০ অথবা ৭০০ সাহাবা নিয়ে মদীনা থেকে রওয়ানা হলেন। এই সফরেই সর্বপ্রথম 'স্বলাতুল খওফ' নামায পড়া হয়েছিল। এ যাত্রায় কোন যুদ্ধ হয়নি। বিনা যুদ্ধে ইসলামী সৈন্য বাহিনী মদীনায় ফিরে আসে। (আর রহীকুল মাখতূম- ৫১৭ পৃষ্ঠা) বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও সীরাতপ্রণেতা ইবনে ইসহাকের মতে এই গাযওয়া ৪র্থ হিজরীর রবীউল আখির মাসে হয়েছিল। ইবনে সা'দ ও ইবনে হিব্বানের মতে ৫ম হিজরীর মুহাররম মাসে হয়েছিল। (আল্ মাওয়াহিব- ২/৫২১)